চতুর্থ খণ্ড

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক,
'পাঠশালার গল্প' 'জীবজগৎ' 'প্রকৃতির কথা'
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

প্রণীত

১৩৪৩

মূল্য ১॥০ টাকা

উৎসর্গ

—০—

ঋষিকল্প

স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺রামকমল ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

অতীতের কথা

মানব

ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম।

অকৃতী সন্তান

হেমেন্দ্র

নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় এবং বন্ধুবান্ধবদিগের সহানুভূতিতে "অতীতের কথার" শেষ খণ্ড "মানব" আজ প্রকাশিত হইল। বৈজ্ঞানিক জগতে মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে, অনুসন্ধান এবং আলোচনা আজ পর্য্যন্ত যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই পুস্তকের সূচনা। মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও যে যথেষ্ট মতভেদ আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ মনস্বী পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণার ফলস্বরূপ অতীতে ক্রমোন্নতির ফলে মানব উৎপত্তির যে একটি চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে তাহা বড়ই বিচিত্র এবং অভিনব। সেই অভিনব চিত্র আজ আমাদের তরুণ পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম। উহাতে নৃতত্ত্বের আলোচনায় তাহাদের মন কিঞ্চিৎ-মাত্রও আকৃষ্ট হইলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের প্রবীণ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র, এম. এ, পি. আর. এস., পি-এইচ্. ডি. মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে আমি তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাহারই কৃতী ছাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ. পুস্তক সংগ্রহ ও প্রুফ্ দেখার কার্য্যে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, এজন্য এই সঙ্গে তাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নিবেদন ইতি

২রা আষাঢ় ১৩৪৩ সাল

বিনীত
গ্রন্থকার

ভূমিকা

অধ্যাপক হেমেন্দ্রবাবুর "অতীতের কথা,—মানব" পড়িয়া যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। চিকাগো মিউজিয়ামে যখন দেখিলাম যে অতীতের মানব-জীবন বুঝাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে নিএন্‌ডারথেল মানবের গ্যালারি করা হইয়াছে, তখন মনে দুঃখ হইল যে এসব বিষয়ে আমাদের দেশে আগ্রহ ও উৎসাহ এত অল্প যে, মানব-জীবনের সামান্য তথ্যগুলিও জনসাধারণের নিকট পৌঁছান সুদূরপরাহত। আজ হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার এই সরস বৈজ্ঞানিক পুস্তকে সেই অভাব অনেকটা পূরণ করিতে পারিয়াছেন। জানি না কোন দিন আমাদের দেশে Osvorn কৃত Hall of Man তৈয়ার হইবে কিনা—কিন্তু যদি কেহ আজ অর্থব্যয় করিতে স্বীকার করেন তাহা হইলে ঐরূপ মানবের ক্রমবিকাশ-জ্ঞাপক গ্যালারি সাজাইতে যে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের অভাব হইবে না, তাহা হেমেন্দ্রবাবুর পুস্তকপাঠে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়।

জীববিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া কি ভাবে ক্রমবিকাশের দুর্ব্বোধ্য ব্যাপারগুলি সুললিত ভাষায় সুখপাঠ্য করিতে হয় তাহা হেমেন্দ্রবাবু বিশেষ করিয়া জানেন। স্তন্যপায়ীদের প্রধানবর্গ Primatesদের মধ্যে মানবের স্থান নির্দ্দেশ করিতে লিনিউসের যুগ হইতে অদ্যাবধি জীববিজ্ঞানবিদ্‌গণ ব্যস্ত। তাঁহাদের মতবাদও অনেক প্রকারের। অথচ সেই মতবাদগুলি এইরূপ সোজা ভাষায় সকলের সাম্‌নে দুই কথায় বলিয়া দেওয়া এক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের পুস্তকে আর বাঙ্গালায় এখানে দেখিলাম। মানবের পূর্ব্বপুরুষ লাঙ্গুলহীন বানর বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী টারসিয়াস্ জাতীয় প্রাণী এবং কীটদিগের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক, ইহা লইয়া আধুনিক পুস্তকে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহারও সারাংশ উহাতে দেখিতে পাইয়া প্রীত হইয়াছি। মানবের বংশাবতারণ বুঝিতে গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও ওরাঙ জাতীয় বনমানুষের বিষয় যতটুকু জানা প্রয়োজন

তাহাও উহাতে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এমন কি এই সব প্রাণীর লুপ্ত পূর্ব্বপুরুষদের ফসিলেরও আলোচনা করা হইয়াছে।

অতীত যুগের আমি যাহাদের আধামানুষ বলি অর্থাৎ যবদ্বীপের কপিমানব, চীনের অর্দ্ধমানব বা পিল্টডাউনের ঊষমানবের আলোচনা বেশ বৈজ্ঞানিকভাবে করা হইয়াছে। সিনানথ্রপাস্ সম্বন্ধে আধুনিক আলোচনাগুলি বেশ সুন্দরভাবে দেওয়া হইয়াছে। নিএনডারথেল মানবের ঘরকন্না, তাহার আনুমানিক আকৃতি, যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিজ্ঞানসম্মত।

আদি মানবের প্রস্তরযুগে, শিকার জীবন, পরে তাহার অগ্নি উৎপাদন, বাসগৃহ ও পরিচ্ছদের উন্নতি সাধনের বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়াতে অতীত যুগের মানব কি ভাবে আধুনিক সভ্য মানবে পরিণত হইয়াছে তাহার ব্যাপারগুলি পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এতদিন ছাত্রদের হাতে দেওয়ার মত সরল মাতৃভাষায় লেখা, মানব-বিজ্ঞানের এরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ অভাব ছিল। পূর্ব্বে ক্রমবিকাশ-বাদ সম্বন্ধে কয়েকখানি ভাল পুস্তক বাঙ্গলায় লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের খবর সাধারণে জানে না, তা' ছাড়া মানব-বিজ্ঞানের বিশেষ আবিষ্কারগুলি মাত্র গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের ছাত্রেরা অনেক সময় ইংরাজিতে দুর্ব্বোধ্য কতকগুলি ল্যাটিন ও গ্রীক্ নাম মুখস্থ করিয়া তাহাদের বিদ্যা খতম করে। নিজ ভাষায় সব কথা সরলভাবে বুঝিয়া না লইলে সেবিষয়ে কোনও দখলই হয় না। এই ভাবের পুস্তক তাহা-দিগকে সেইদিকে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে অনেকটা সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

২৫শে ভাদ্র,
১৩৪১ সন

শ্রীপঞ্চানন মিত্র, এম. এ.,
পি. আর. এস্, পি-এইচ্. ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ।

অতীতের মানব

ইতর জীবের উন্নতিতে
মানব-দেহ গঠন,
এর ভিতরেও সত্য আছে
কেও ভেবেছ কখন ?

তোমাদের সকলেরই হয়ত ধারণা এই যে, মানুষ চিরকালই একরূপ ছিল। এ ধারণা যে শুধু তোমাদেরই তাহা নহে, কিছুকাল পূর্ব্বে অনেকেরই এই ধারণা ছিল। মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আজকাল সে ধারণা দূর হইয়া গিয়াছে। ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ প্রচার দ্বারা, মহামতি ডারউইন ও তাঁহার অনুগামী পণ্ডিতগণ, এবিষয়ে পৃথিবীর চিন্তাশীল মানবের মনে সন্দেহের উৎপাদন করেন। আজকাল জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রায়

সকলেই, ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে ইতরপ্রাণী হইতেই যে কালক্রমে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এ ধারণা পোষণ করেন, তাহার কথা এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। তাহা হইতেই ইহা যে কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে।

মানুষ স্তন্যপায়ী প্রাণী। সুতরাং কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতেই যে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে কেহ উদ্ভিদ্‌ভোজী, কেহ বা হিংস্র, কেহ বা দন্তর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর প্রাণী যে আছে তাহাও তোমরা জান। সেই স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে প্রধান স্তন্যপায়িবর্গের (Primates) অন্তর্গত প্রাণী সলাঙ্গুল বানর (Monkeys), লাঙ্গুলহীন বানর (Apes) এবং মানুষের স্থান সকলের উপর। মানব জাতির আদি পুরুষ এই বানর জাতীয় কোন প্রাণীই হইবে। তাহা কি এবং কাহারা, তাহার বিষয়েই জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া নানা তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন।

ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, এই একটা ভুল ধারণা সাধারণের মনে প্রথমতঃ স্থান লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে খুব কমই আছেন, যাঁহারা জীবন্ত কোন বানরকেই মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিবেন। মানুষ ঠিক বানর হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু মানুষ এবং বানরের এমন কোন প্রাণী হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, যাহার আকার মানুষ কিংবা বানর, ঠিক কাহারই মত নহে। তাহাদের উভয় হইতেই উহা অনেক অংশে ভিন্ন রকমের, এবং বহুকাল পূর্ব্বেই উহা ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ইহাই মত। মহাত্মা ডারউইনও পূর্ব্বে এবিষয়ে আভাস দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণও দীর্ঘকাল অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিয়া এই মতেরই অনুমোদন করিতেছেন। এই মতানুযায়ী বানর মানুষের জ্ঞাতি হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষ নহে। পূর্ব্ব-

প্রচলিত মত ও বর্ত্তমান মতের পার্থক্য সহজে যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার তাহার জন্য ক্রমোন্নতির ধারার দুইটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল।
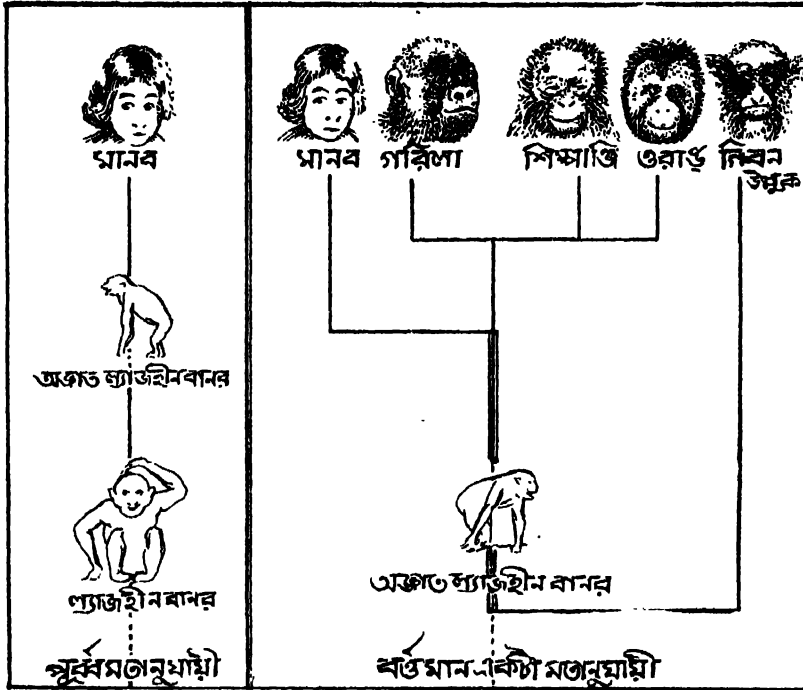
ল্যাজহীন বানরের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধবিষয়ক ক্রমোন্নতির দুইটি চিত্র

কি কি কারণে বানরকে মানুষের জ্ঞাতি বলা হইয়া থাকে এখন তাহাই দেখা যাক্। চিন্তা করিলে এই মতের অনুকূলে অনেক কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। চিড়িয়াখানায় ছোট বড় বহু আকারের বানর আছে। তোমরা যখনই চিড়িয়াখানায় যাও তখনই তাহাদিগকে দেখিয়া থাক। উহাদের আকার, হাবভাব প্রভৃতি যদি একটুও লক্ষ্য করিয়া থাক, তবে উহাদের সঙ্গে মানুষের যে নানা বিষয়েই সাদৃশ্য আছে তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের চোখে পড়িয়াছে। মুখ, হাত, পা এবং শরীরের গঠনে, উহারা মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ

একরূপ না হইলেও মূলতঃ একই আকারের। মানুষের কঙ্কালের সঙ্গে যদি উহাদের কঙ্কাল তুলনা করিয়া দেখা যায় তবে একথা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। উহাদের হাত-পায়ের গঠনে আপাততঃ যে পার্থক্য দেখা যায়, লক্ষ্য
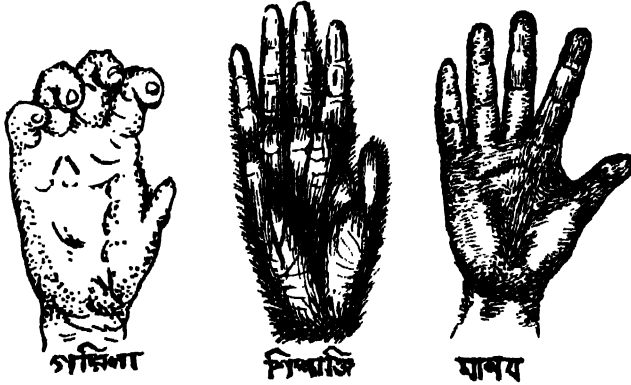
হাতের তুলনামূলক ছবি

করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহা প্রধানতঃ এই সকল অঙ্গের দৈর্ঘ্যের ইতর বিশেষ হইতেই দেখা গিয়া থাকে। উহাদের হাবভাব যদি একটুকুও লক্ষ্য

পায়ের তুলনামূলক ছবি

করিয়া থাক তবে উহাদের সঙ্গে মানুষের যে সে সকল বিষয়েও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে নিশ্চয়ই তাহা তোমাদের চোখে পড়িয়াছে। উহাদের চোখ-মুখের ভাব অনেকটা মানুষের মত। উহারা উহাদের বাচ্চাগুলিকেও প্রায় মানুষের মতই

আদর-যত্ন করিয়া থাকে। ঠিক মানুষের মত না হইলেও উহাদের যে বুদ্ধি আছে তাহা উহাদের ব্যবহারে বেশ বুঝিতে পারা যায়। পিঞ্জরের ভিতর
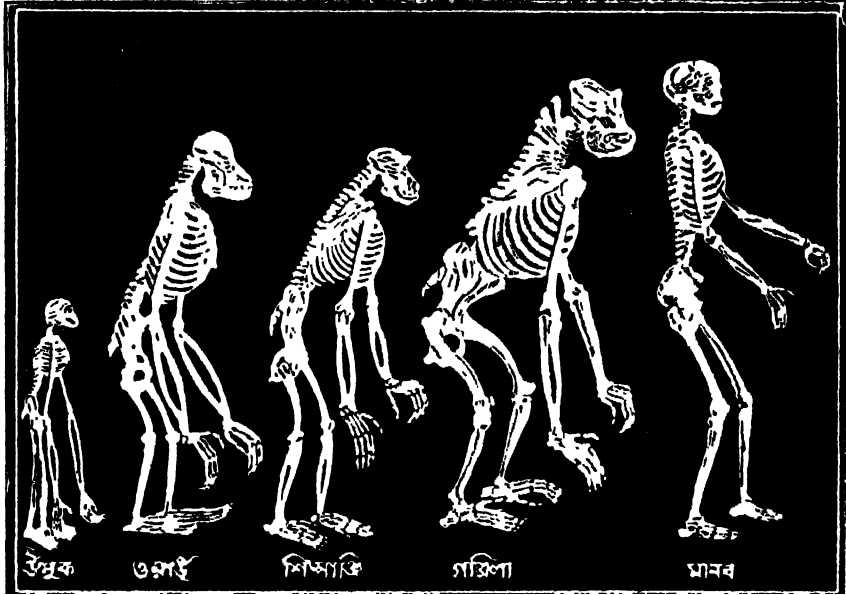
নর-বানরের কঙ্কালের তুলনামূলক ছবি

হইতে হাত বাড়াইয়া, দর্শকের নিকট হইতে উহারা ভিখারীর ন্যায় খাবার ভিক্ষা করে তাহা হয়ত তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ।

মানব জাতির বুনো জ্ঞাতি
আছে তা'রা চারটি ভাই,
সকল কথা বলার আগে
তাদের কথা বলা চাই।

সকল রকম মেরুদণ্ডী প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করিলে বানরের সঙ্গেই যে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্য, সে বিষয় বোধ হয়, তোমরা সকলেই

বুঝিতে পারিয়াছ। বানরের মধ্যে আবার লাঙ্গুলহীন বানর যথা শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাঙ্‌ওটাঙ্‌ ও উল্লুকের (Gibbon) সঙ্গেই মানুষের সাদৃশ্য বেশী। মানুষের কথা বলিবার শক্তি আছে, ভাষা আছে; তা ছাড়া মানুষের মগজের পরিমাণও উহাদের সকলের চাইতে বেশী। তাই মানুষ এই সকল বানর হইতে পৃথক্।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধের প্রায় সকল বন-জঙ্গলেই সাধারণ-ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে। তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, অতীতে যে সকল মানবাকৃতি জীব (Anthropoid) বা লাঙ্গুলহীন বানর ছিল তাহাদের মধ্যে মাত্র পূর্ব্বোক্ত চারিটি প্রাণীই বর্ত্তমান আছে। অন্যান্য সকলেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে গরিলা ও শিম্পাঞ্জি আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের অধিবাসী; তৃতীয় ওরাঙ্‌ওটাঙ্‌, সুমাত্রা ও বোর্‌নিও দ্বীপের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়; চতুর্থ উল্লুক বা বনমানুষ (Gibbon) ভারতবর্ষ, হাইনান (Hainan), বোর্‌নিও, সিলিবিস, জাভা এবং সুমাত্রা দ্বীপের অরণ্যে বাস করিয়া থাকে।

সলাঙ্গুল বানরের মত উহাদের যে শুধু ল্যাজ নাই তাহা নহে, সলাঙ্গুল বানরের গণ্ডস্থল বা গালের নীচে যেমন ছোট থলে থাকে, উহাদের তাহা থাকে না। তা ছাড়া উহাদের শরীরের রোমও সলাঙ্গুল বানরের মত তত ঘন নহে। জন্মের পর প্রায় সকল বিষয়েই মানবশিশুর সঙ্গে উহাদের শাবকের খুবই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে তুলনায় নিম্নস্তরের সলাঙ্গুল বানর-শাবকের সঙ্গে উহাদের সাদৃশ্য নিতান্ত কম। পায়ের তুলনায় উহাদের হাত আবার ঐ সকল বানরের হাতের চাইতে লম্বা। অধিকাংশ সময় গাছের উপর বাস করিলেও যখন মাটিতে নামিয়া আসে, তখন উহারা সাধারণতঃ হাতের উপর ভর দিয়াই চলাফেরা করে। কিন্তু সে সময় নিম্নশ্রেণীর সলাঙ্গুল বানরের মত করতলের উপর ভর না দিয়া মাত্র হাতের আঙ্গুলের পিছনদিকে ভর করিয়াই গমনাগমন করিয়া থাকে। চলিবার জন্য পায়ের মত তাহাদের হাতের তেমন

ভাবে ব্যবহার করিতে হয় না। এই সকল কারণে সলাঙ্গুল বানর হইতে মানুষের সঙ্গেই উহাদের সম্বন্ধ নিকট বলিয়া বোধ হয়।

পৃথিবীর প্রাচীন স্তরে প্রধান স্তন্যপায়িবর্গের যা চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা সে সময়ে আকারে কাঠবিড়াল কিংবা ইঁদুরের চাইতে বেশী বড় ছিল না। দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমোন্নতিতে উহাদের যে আকার বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্তরে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানের উল্লুক, মানবাকৃতি জীবের মধ্যে খুব প্রাচীন এবং আকারে ছোট। ওজনে উহারা প্রায় সাত সের হইতে চৌদ্দ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অন্য দিকে গরিলা, ওরাঙ্‌ওটাঙ্‌ ও শিম্পাঞ্জি এক একটি মস্তবড় মানবাকৃতি জীব। তাহারা আকারে যেমন বড় ওজনেও আবার তেমনি ভারি। তাহাদের এই ওজন, মোটা মানুষের মত শরীরে শুধু চর্ব্বি জমিয়াই যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নহে। তাহাদের সুদৃঢ় মোটা-সোটা হাড়, মাংসপেশী এবং নাড়ীভুড়ির জন্যই তাহাদের দেহের এই ওজন। এই সকল মানবাকৃতি জীবের সঙ্গে মানবের অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ (Anthropologists) আলোচনার সুবিধার জন্য উহাদিগকে বৃহদাকার প্রধান স্তন্যপায়ী (The great primates) প্রাণী বলিয়া এক পৃথক্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

গরিলা

গরিলার বাস আফ্রিকাতে,
শিম্পাঞ্জি আর কাফ্রি সাথে।

যে চারিটি ল্যাজহীন কপির কথা এই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের বিষয় সকল কথা এখনও জানা যায় নাই সত্য, কিন্তু যাহা জানা গিয়াছে তাহাও নিতান্ত কম নহে। উহাদের কথা অন্ততঃ মোটামুটিভাবে তোমাদের জানা

কর্ত্তব্য। উহাদের মধ্যে গরিলা জাতিই সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আমাদের সেই বুনো জ্ঞাতি গরিলা জাতির কথাই তোমাদের নিকট প্রথম বলা হইল। কোন কোন বিষয়ে মানুষের সঙ্গে উহাদের খুবই বেশী সাদৃশ্য আছে, যাহা অন্য কোন ল্যাজহীন কপির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।
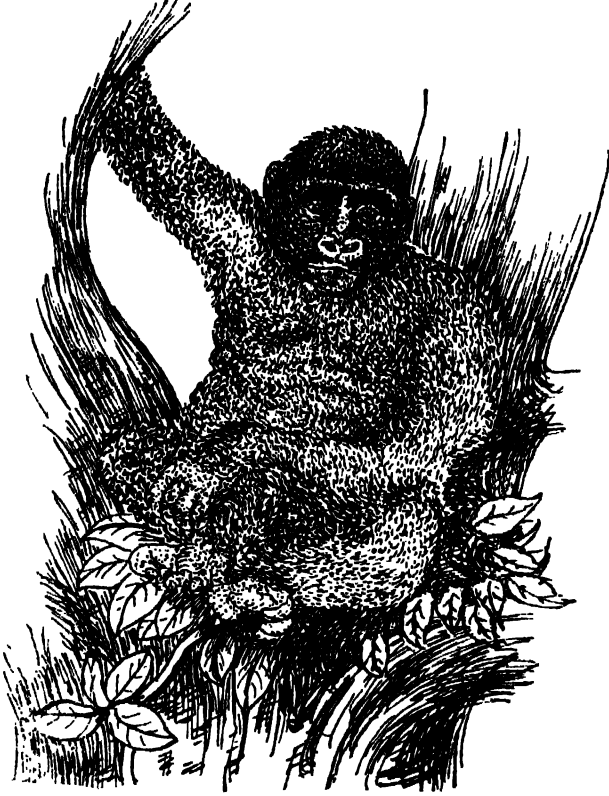
বিশ্রামনিরত গরিলা

উহাদের পায়ে এমন কতকগুলি মাংসপেশী দেখিতে পাওয়া যায় যাহা মানুষের পায়েই সম্ভব। তা ছাড়া কোন কোন গরিলার হাতের বুড়ো আঙ্গুলেও এমন কতকগুলি মাংসপেশী আছে যাহা মানুষ ছাড়া আর কাহারও হাতের বুড়ো আঙ্গুলে দেখিতে পাওয়া যায় না।

উহাদের আকার যে কিরূপ, যে ছবি দেওয়া হইল তাহা হইতেই তোমরা অনুমান করিতে পারিবে। মৃত গরিলার দেহ স্বাভাবিক আকারে কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে, তোমরা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারিবে।

আকারে ও দৈহিক বলে উহারা মানব সদৃশ যত রকম বানর আছে তাহাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহারা সাধারণতঃ কাহারও সঙ্গে মিছামিছি ঝগড়া করিতে আসে না; গভীর জঙ্গলে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে ভালবাসে। কিন্তু তাহাদের আবাসস্থানের কাছে কেহ গেলে তাহারা ভীষণ রাগিয়া যায়। বিপদ গুরুতর বুঝিলে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের শিশু সন্তানদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচারের আশঙ্কা করিলে, বন্দুকধারী খুব সাহসী শিকারীকেও আক্রমণ করিতে তাহারা পিছু-পা হয় না। মধ্য আফ্রিকা ও আফ্রিকার পশ্চিমাংশে গভীর বনের ভিতর মানুষের যাতায়াতের বাহিরেই তাহারা বাস করে, কিন্তু সভ্য মানবের হাত হইতে তাহাদের বংশ রক্ষা পাওয়া দায়।

গরিলা-দলপতি ছোট ছোট দল বাঁধিয়া বনের ভিতর পাহাড়-পর্ব্বতের নিকট যেখানে বড় বড় গাছ থাকে সেখানে সপরিবারে বাস করিবার জন্য বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এক একটি গরিলা-পরিবারে ছয়টি হইতে কুড়িটি পর্য্যন্ত গরিলা থাকিতে দেখা যায়। গরিলার দল মাত্রই এক একটি গরিলা-পরিবার। প্রত্যেক দলের দলপতির অধীনে দুই তিনটি পূর্ণবয়স্কা স্ত্রী-গরিলা এবং তাহাদের সঙ্গে নানা বয়সের কয়েকটি সন্তান থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গরিলার চেহারার খুবই পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। মানুষ কিংবা শিম্পাঞ্জির বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চেহারার এতটা পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় না। এক একটি পূর্ণবয়স্ক গরিলার শক্তি, পাঁচটি পূর্ণবয়স্ক সবল মানুষের সমান হইবে। জন্মের সময় গরিলাশাবক খুবই ছোট থাকে, ওজনে সদ্যজাত একটি মানবশিশুর অর্দ্ধেক হইবে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক একটি গরিলা ওজনে একটি পূর্ণবয়স্ক সবল মানুষের দ্বিগুণ। তাহার দাঁতের এবং হাতের শক্তি

অসাধারণ, মানুষের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। মানবাকার প্রাণীর মধ্যে গরিলার ক্রমোন্নতি কেবল তাহার শক্তি এবং আকারের দিকেই দেখা গিয়া থাকে।

এক একটি পুং-গরিলার আকার দৈত্য-দানবের মত। উহা লম্বায় যে খুব বড় তাহা নহে, মাত্র চারি হাত, কিন্তু উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এরূপ সবল এবং পুষ্ট যে তাহাকে দেখিলে ভীষণাকার দৈত্য বলিয়া মনে হয়।

রাত্রিবেলা গরিলা-দলপতি গাছতলাতে ডালপালা জড় করিয়া শয্যা প্রস্তুত করে এবং তাহার উপর নিদ্রা যায়। দলের অন্যান্য গরিলা গাছের উপরেই ঘুমাইয়া থাকে, কিন্তু সকলকেই দলপতির দৃষ্টি-সীমার ভিতরে থাকিতে হইবে।

আবদ্ধ অবস্থায় পিঞ্জরের ভিতর গরিলা বেশীদিন বাঁচিতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়। লণ্ডন নগরের চিড়িয়াখানায় নানা বয়সের যে কয়েকটি গরিলা আনা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র একটিকে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। তাহার নাম রাখা হইয়াছিল জনি (Johnny)। তাহার বয়স যখন মাত্র একদিন তখন তাহাকে ধরা হয় এবং স্থানীয় একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা মানবশিশুর মত প্রতিপালন করা হয়। তাহাতে তাহার বন্য স্বাধীন প্রকৃতির অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল, তাহাই বোধ হয় তাহার দীর্ঘজীবন লাভের কারণ। মানবশিশুর মত বিড়ালছানা নিয়া সে খেলা করিত, কাতুকুতু দিত, ভীষণ ভাবে হাসিত এবং কোন কারণে রাগ হইলে হক্ হক্ শব্দ করিয়া চীৎকার করিত। সকল রকমের ফল ও দুধই তাহার খাদ্য ছিল।

এপর্য্যন্ত দুই শ্রেণীর গরিলার কথা জানা গিয়াছে। তাহাদের আবাস-স্থানের যেমন পার্থক্য আছে তেমনি আকারগতও কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর গরিলা উচ্চভূমির অধিবাসী ও অন্য শ্রেণী নিম্নভূমির অধিবাসী। গরিলা জাতি অন্যান্য ল্যাজহীন বানর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হইলেও গরিলা-শিশু এবং শিম্পাঞ্জি-শিশুর মধ্যে পার্থক্য ধরা বড় কঠিন। ক্রমোন্নতির পথে গরিলা ও শিম্পাঞ্জি যে পরস্পর জ্ঞাতি ভাই এবং তাহাদের অতি বৃদ্ধপিতামহ যে একজনই ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সপরিবারে গরিলা-দলপতি

এখন তাহাদের মুখের বিশেষতঃ নাক ও কানের গঠনে বেশ পার্থক্য রহিয়াছে ; তাহা হইতে তোমরা গরিলা এবং শিম্পাঞ্জি-শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাদের পার্থক্য এই শিশুকালেও ধরিতে পারিবে। গরিলার দাঁত দেখিলে এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না, কেননা গরিলার শ্বদন্ত এবং চর্ব্বণদন্ত খুবই সবল এবং পুষ্ট। মানসিক বৃত্তির হিসাবেও গরিলা এবং শিম্পাঞ্জিতে অনেক তফাৎ। শিম্পাঞ্জি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল এবং আমোদপ্রিয়, আর গরিলা শিশুকাল হইতেই ধীর এবং গম্ভীরপ্রকৃতির।

গরিলা সাধারণতঃ গাছের মোটাসোটা মূল, কন্দ, বাঁশের কচি লম্বা অঙ্কুর খুব প্রচুরপরিমাণে খাইয়া থাকে। কলার থোর ও আকের ডগা তাহাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। এজন্য সময় সময় তাহাদের নিকটবর্ত্তী অধিবাসীর কলা ও আকের বাগানে ঢুকিয়া তাহারা যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। উহাদের খাদ্য এখন যেরূপই হউক, তাহা প্রচুরপরিমাণে হওয়া চাই। উহারা ঘোড়ার নাদির মত খুব বড় বড় গোলাকার মলত্যাগ করিয়া থাকে। গরিলার বিষয় অনেক কথাই এখনও জানা যায় নাই। লোকালয়ের বাহিরে অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে বাস করে বলিয়াই উহাদের সকল কথা জানার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা।

ওরাঙ্ ওটাঙ্

সুমাত্রা আর যবদ্বীপে
ওরাঙ করে বাস ;
কদাকার সে কুড়ের রাজা—
নড়্‌তে বার মাস।

আকার হিসাবে গরিলার পরেই মানবাকৃতি প্রাণীর মধ্যে ওরাঙের স্থান। দানবাকৃতি গরিলা আফ্রিকার অধিবাসী, আর তাহারই ছোট ভাই ওরাঙ্—

সুমাত্রা ও বোর্নিও দ্বীপের জঙ্গলে বাস করিতেছে। এখানে একটা বড় মজার কথা এই যে, কাল কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকাতে গরিলা বাস করে, তাহারও রোমের রং কাফ্রিদের মত কাল। আর সুমাত্রা ও বোর্নিও দ্বীপের অধিবাসীদিগের শরীরের রং যেমন লাল্চে কটা তেমনি ওরাঙের রোমের রং-ও লাল্চে কটা; কিন্তু ওরাঙ্ দেখিতে গরিলার চাইতেও কদাকার।

পুং ওরাং-ওটাং

ওরাঙ্‌ওটাঙ্ খুব উঁচু গাছের আগাতে ডালপালা একত্র করিয়া বাসা বাঁধে এবং তাহার উপর নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যায়। যাহাতে কোন শত্রু ভূমি হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে তাহার জন্যই উহারা এতটা সতর্কতা অবলম্বন করে। তাহারা এত তাড়াতাড়ি তাহাদের এই বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরের চিড়িয়াখানা হইতে একদিন রাত্রিবেলা একটি ওরাঙ্ পলাইয়া যায়। সে বাহির হইয়াই চিড়িয়াখানার

বিশ্রামনিরত ওরাঙ্-দম্পতি

নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষের উপর আধঘণ্টার মধ্যেই বাসা বাঁধিয়া তাহাতে আরামে নিদ্রা গিয়াছিল। পরদিন প্রাতে তাহার রক্ষকগণ তাহাকে পুনরায় বন্দী করিয়া চিড়িয়াখানায় নিয়া আসিল, কিন্তু তাহার নির্ম্মিত বাসা, লণ্ডনে ওরাঙ্-নির্ম্মিত প্রথম বাসা বলিয়া, একটি দেখিবার মত জিনিষ হিসাবে সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুং-ওরাঙ্ সাধারণতঃ নির্জ্জনে একাকী থাকিতে ভালবাসে এবং ওরাঙ্-মাতা তাহার শাবকগণকে সঙ্গে নিয়া সদলবলে নানা স্থানে ভ্রমণ করে। পুং-ওরাঙ্ প্রত্যহই নিজের বাসের জন্য নূতন বাসা বাঁধিয়া তাহাতে বাস করে। কোন অসুবিধা থাকিলে একদিন পর পরও তাহাকে নূতন বাসা বাঁধিতে দেখা যায়।

তাহাদের সমশ্রেণীর মধ্যে ওরাঙ্ সর্ব্বাপেক্ষা নিরীহ এবং ভীরু প্রাণী। উহারা প্রায় সব সময় গাছের উপরেই বাস করে, নিতান্ত বিপদে না পড়িলে মাটিতে নামে না। উহারা খুবই ধীরগামী। গাছে গাছে ভ্রমণ করিবার সময় তাহারা খুব আস্তে আস্তে শাখা হইতে শাখান্তরে চলাফেরা করিয়া থাকে। পুরুষ ওরাঙ্ ওজনে প্রায় আড়াই মণ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায় এবং শেষবয়সে উহার মুখের চারিদিকে, কানের সম্মুখদিকে একপ্রকার অদ্ভুত গদির উৎপত্তি হয়। মাদী ওরাঙের মুখের চারিদিকে উহা কখনও গঠিত হইতে দেখা যায় না। ওরাঙের হাতের শক্তি মানুষে হাতের শক্তির দ্বিগুণ। সে একবার ধরিলে ছাড়ান দায়।

উহারা ভীরু হইলেও স্বাধীনতাপ্রিয়। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, সুমাত্রা দ্বীপ হইতে একটি ওরাঙ্-পরিবারের সকলকে একত্রে বন্দী করিয়া, ইউরোপে নেওয়া হইয়াছিল। সেখানে লৌহপিঞ্জরের ভিতর শিশুগণ সহ মাতা-পিতার বন্দী অবস্থার করুণ দৃশ্য দেখিয়া দর্শকমাত্রেরই হৃদয় বিচলিত হইত। তাহাদের বন্দী অবস্থার সেই অসহায় ভাব দেখিয়া নিতান্ত হৃদয়হীনের হৃদয়েও দয়ার উদয় হইত।

শিম্পাঞ্জি ও উল্লুক

শিম্পাঞ্জিরা সকল কাজে
মানব হ'তে চায়,
লম্বা হাত মাথায় তুলে
বোকা উল্লুক ধায়।

ওরাঙের পরেই আকার হিসাবে শিম্পাঞ্জির স্থান। শিম্পাঞ্জিও গরিলার মত আফ্রিকারই অধিবাসী। শিম্পাঞ্জির দেহও খুব সবল এবং পুষ্ট। তাহাদের হাত-পাও বেশ বড় বড় এবং শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু দাঁতের শক্তিতে উহারা সকলের চাইতে দুর্ব্বল। শিম্পাঞ্জিকে লম্বায় প্রায় আড়াই হাত পর্য্যন্ত উঁচু হইতে দেখা যায়। উহাদেরও স্বভাব অনেকাংশে ওরাঙের মতই, কিন্তু উহারা ওরাঙের মত ভীরুপ্রকৃতির নহে। শিম্পাঞ্জিরা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। উহাদের এক একটি পরিবারে নানা বয়সের শিম্পাঞ্জির সংখ্যা বারটি হইতে চল্লি পর্য্যন্ত দেখা যায়

শিম্পাঞ্জি

ল্যাজহীন বানরের মধ্যে শিম্পাঞ্জিকে বুদ্ধির হিসাবে কেহ কেহ প্রথম স্থান দিয়া থাকেন; কিন্তু মস্তিষ্কের পরিমাণ ও আকার হিসাবে উহারা গরিলা ও ওরাঙের নীচে। উহারা যে সকলের চাইতে কর্ম্মঠ, সাহসী এবং সন্তুষ্ট সে বিষয়ে কোন ভুল নাই; কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের এসকল গুণ মানুষের চাইতেও যে বেশী তাহা কখনও বলা চলে না। উহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে

পারে, কিন্তু হাত-পায়ের সাহায্যে উহারা অধিকাংশ সময়ই গাছে গাছে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ; অথচ ওরাঙের মত মাটিতে নামিতে আলস্য বোধ করে না। গাছতলায় বনের ভিতর দিয়া উহারা অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারে— কোন অসুবিধা বোধ করে না।

শিক্ষা দিলে শিম্পাঞ্জি মানুষের মত অনেক কিছু করিতে পারে। মানুষের মত পোষাক পরা ও পোষাক ছাড়া, টেবিলে বসিয়া খাবার খাওয়া, চা পান করা প্রভৃতি তাহারা ঠিক মানুষের মতই করিয়া থাকে। অবশ্য এসকল বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হয়। শিক্ষা দিলে তাহারা বাইসাইকেল চড়িতে পারে, এমন কি কয়েকটি সংখ্যা পর্যন্ত গণনারও যে শক্তি তাহাদের আছে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

পোষাক পরিহিত শিম্পাঞ্জি

মানবাকারের ল্যাজহীন বানরের মধ্যে উল্লুক (Gibbon) আকারে সকলের চাইতে ছোট হইলেও উহাদের উৎপত্তির হিসাবে উহারা সকলের চেয়ে প্রাচীন। উহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ সকলের তুলনায় কম সুতরাং বুদ্ধিও সকলের চেয়ে কম। এজন্য তাহার স্থান সকলের নীচে। উহার হাত শরীরের অনুপাতে খুবই লম্বা। উহারা যখন দাঁড়াইয়া চলাফেরা করে তখন উহাদের হাত ভূমি স্পর্শ করে। তোমরা মানুষের আজানুলম্বিত বাহুর কথা হয়ত অনেকেই শুনিয়াছ, সে হিসাবে উহাদের হাত আভূমি স্পর্শী বলা যাইতে পারে, কিন্তু

উহারা যখন সোজা হইয়া দুই পায়ে হাটিতে থাকে তখন উহারা উহাদের এই লম্বা দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া রাখে। তাহাতে উহাদের সমভাবে দেহের ভার রক্ষা করিয়া হাটিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

যবদ্বীপের শ্বেত উল্লুক (Gibbon)

উল্লুক সহজেই পোষ মানে। মস্তিষ্ক কম হইলেও, শিক্ষা দিলে নানারকম ব্যায়াম শিক্ষা করিবার মত বেশ শক্তি যে তাহাদের আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। গাছে চড়িয়া ভ্রমণ করার চাইতে তাহারা দোল দিয়া এক ডাল হইতে দূরবর্ত্তী অন্য আর একটি ডালে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই বেশী ভালবাসে। এই রূপেই দোল দিয়া এবং লাফাইয়া লাফাইয়া তাহারা গাছে গাছে ভ্রমণ করে। এইরূপে লাফাইয়া তাহারা পঁচিশ হাত দূরের গাছের ডালও ধরিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা হয় না।

পূর্ব্বোক্ত চারিটি ল্যাজহীন বানর, যাহাদের কথা এখানে বলা হইল,

তাহাদের মধ্যে শিম্পাঞ্জির সঙ্গেই মানুষের আবার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য বেশী। শিক্ষা দিলে শিম্পাঞ্জি বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে এবং অনেক বিষয়েই মানুষের অনুকরণ করিতে পারে। শুধু এই সকল কারণেই, শিম্পাঞ্জির সঙ্গে মানুষের যে নিকটসম্বন্ধ তাহা নহে। মানবশিশু ও শিম্পাঞ্জিশিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন তাহাদের আকারেও বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য বানরশিশুর সঙ্গেও যে সাদৃশ্য না আছে তাহা নহে। উহাদের সকলেরই হাত-পায়ের আকার মূলতঃ একই রকমের হইলেও মানুষের সঙ্গে তুলনায় কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন রকমের। উহাদের
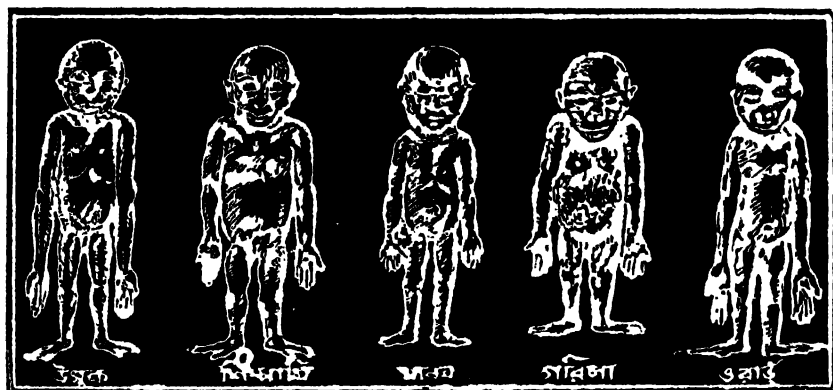
ভ্রূণের তুলনামূলক ছবি

তুলনামূলক ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে এবং একথা যে কতটা সত্য তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিবে। মাতৃগর্ভে বাসকালে মানবশিশু হইতে উহাদের সকলেরই শরীর প্রথমতঃ কোমল রোমাবৃত থাকে। জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে উহাদের কাহারই রোম থাকে না—শুধু মাথাতে ঘন চুল গজায়। জন্মের পর সকলেরই দেহ পুনরায় রোমাবৃত হয়, কিন্তু মানুষের দেহ পুনরায় আর রোমাবৃত হয় না।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে শিম্পাঞ্জি এবং গরিলার মধ্যে গরিলাই পৃথিবীর প্রাচীনতর অধিবাসী। মানুষের সঙ্গে গরিলার যে সকল বিষয়ে

সাদৃশ্য আছে মোটামুটিভাবে তাহার কথা তোমাদিগের নিকট ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আদি কপি মানব, শিম্পাঞ্জি ও গরিলার পূর্ব্বপুরুষেব উৎপত্তি যে অজ্ঞাত প্রাণী হইতে হইয়াছিল, সেই প্রাণী হইতে মানুষ, গরিলা এবং শিম্পাঞ্জির সম্বন্ধের দূরত্ব তুলনা দ্বারা বিচার করিলে, গরিলাকেই আবার মানুষের সন্নিহিত জ্ঞাতি বলিয়া মনে হইবে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করিলে গরিলাকে যদিও মানুষের নিকটতর প্রাণী বলিতে হয় তবুও উহারা মানুষের নিকট হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিতে চায় বলিয়া এবং অন্যদিকে শিম্পাঞ্জি মানুষের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে বলিয়া, শিম্পাঞ্জিকেই উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মানব-ভাবাপন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

পতঙ্গভুক্ হইতে সুরু
মানব জাতির ধারা,
নিকট জ্ঞাতি নয় কি তবে
ল্যাজহীন কপি যারা?

যে অজ্ঞাত ল্যাজহীন কপি হইতে মানবশাখার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির কথা জানিবার জন্য, পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, তাহা বড় বিস্ময়জনক। বানরকে মানুষের জ্ঞাতি বলিয়া অনুমান করিতে হয়ত তোমাদের কোন অসুবিধা হইবে না, কিন্তু এখন যদি বলি যে, পতঙ্গভুক্ শ্রেণীর কোন প্রাণী হইতেই মানব সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইলে হয়ত তোমরা বিশ্বাসই করিতে চাহিবে না। কেননা পতঙ্গভুক্ প্রাণীর সঙ্গে মানুষের যে কোনই সাদৃশ্য নাই। কিন্তু ইহা যে একেবারে অসম্ভব তাহাও বলার উপায় নাই। ভগবানের রাজ্যে এরূপ অসম্ভবও যে সম্ভব হয় তাহার দুই চারিটি উদাহরণ তোমরাও জান এবং দেখিয়াছ। বিশ্রী শুঁয়াপোকা হইতে বিচিত্র প্রজাপতি, ব্যাঙাচি হইতে ব্যাঙের উৎপত্তি তোমরা এখন আর অবিশ্বাস কর না। উহাদের এই পরিবর্ত্তনের বিষয়

তোমাদের জানা না থাকিলে শুঁয়াপোকা হইতে প্রজাপতি এবং ব্যাঙাচি হইতে ব্যাঙের উৎপত্তি তোমরা কখনও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কিনা সন্দেহ। এই পরিবর্ত্তন তোমরা লক্ষ্য করিতে পার, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যে পতঙ্গভুক্ জাতির প্রাণী হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা দেখিবার সুযোগ মানুষের নাই; সুতরাং অনুসন্ধান, অনুমান, বিচার, এবং যুক্তি-তর্ক দ্বারা জ্ঞানিগণ এবিষয়ে যে সকল সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা যে নিতান্ত অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য তাহা কখনও মনে করা যাইতে পারে না।

মানুষের পূর্ব্বপুরুষের যে কি অবস্থা এবং কি আকার ছিল সে সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে এখানে বলা হইল। মানুষ কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতে কি ভাবে, কি কারণে, ক্রম-বিবর্ত্তনের দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা ঠিক করা যে খুব কঠিন ব্যাপার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও এ বিষয়ের অনুসন্ধানও আলোচনা দ্বারা, সত্য নির্দ্ধারণ করাতে যে আনন্দ, তাহা তোমরাও বুঝিতে পার। নিজেদের পূর্ব্বপুরুষের কথা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

কোন কোন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতের মত এই যে, পতঙ্গভুক্ প্রাণী হইতে জীবজগতে এই ক্রমোন্নতির গতি পাঁচদিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

১। কোন কোন পতঙ্গভুক্ খাদ্যসংগ্রহের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় বড় প্রাণিবধের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। হয়ত উহারা নিজেদের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জ্ঞাতি বধ করিয়াও খাদ্যসংগ্রহে পিছুপাও হয় নাই। তাহাদের ক্রমোন্নতিতেই হিংস্র মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেমন কুকুর, বিড়াল, বাঘ, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি প্রাণীর উৎপত্তি হইল।

২। তাহাদের মধ্যে কোন কোন পতঙ্গভুক্ প্রাণী আবার উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণিরূপে পরিণত হইল। তাহাদের ক্রমোন্নতিতেই ক্ষুরবিশিষ্ট নানাজাতীয় বহু প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্য কালক্রমে তাহাদের মধ্যে কাহারও বা সুবিশাল দেহ, কাহারও বা অসাধারণ দ্রুত গতি, কাহারও বা দৈহিক

শক্তি লাভ হইল। তাহাদেরই উদাহরণ-স্বরূপ তোমাদের পরিচিত হাতী, ঘোড়া, গরু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৩। অন্য কতকগুলি পতঙ্গভুক্ গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতরে বাস করার দিকে মন দিয়াছিল। তাহাদেরই ক্রমোন্নতিতে মূষিকজাতীয় যত রকম দন্তুর প্রাণীর আবির্ভাব হইল। আত্মরক্ষার জন্য গর্ত্তে বাস নিরাপদ বলিয়া এখনও উহারা গর্ত্তের ভিতরেই বাস করিয়া থাকে; খরগোস, ইঁদুর, কাঠ-বিড়ালী প্রভৃতি প্রাণী উহাদের উদাহরণ।

৪। তাহাদের মধ্যে কোন কোন পতঙ্গভুক্ আবার আত্মরক্ষার জন্য বায়ুর উপর ভর করিয়া আকাশগমনের চেষ্টা করিতেছিল। তাহা হইতেই ক্রমোন্নতিতে উহাদের সম্মুখদিকের প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ হাত দুইটি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া, কালক্রমে ডানার আকার ধারণ করিল; বর্ত্তমানের বাদুর, চামচিকা প্রভৃতি প্রাণী উহাদের উদাহরণ।

৫। অবশিষ্ট পতঙ্গভুক্ প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য বৃক্ষারোহণের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহা হইতেই ক্রমোন্নতিতে প্রধান স্তন্যপায়ী প্রাণিবর্গের (Primates) আবির্ভাব হইল। এইরূপে যত রকম নর-বানর সকলই উহাদিগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে প্রায় সকল প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই লেমুর ও যত রকম নর-বানর সকলকেই এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী বলিয়া ধরিয়া থাকেন। এই প্রধান স্তন্যপায়িবর্গকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। লেমুর জাতীয় যত রকম প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই লেমুরাকৃতি (Lemuroidea) শ্রেণীর অন্তর্গত; আর যত রকম নর-বানর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ মানবাকৃতি (Anthropoidea) প্রাণীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। এ পুস্তকে মানুষের উৎপত্তির কথাই প্রধানতঃ আলোচনা করা হইবে। বানরের পরেই লেমুরের সঙ্গে মানুষের নিকট-সম্বন্ধ।

এখনও নানা রকমের লেমুর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রায় সকলেই

দিনের বেলা নীরবে, গোপনে কাল কাটাইয়া থাকে এবং রাত্রিবেলা বাহির হয়। ল্যাটিন ভাষায় লেমুর শব্দের অর্থ নিশাচর প্রেতাত্মা। গুপ্ত নিশাচর বলিয়া উহাদের এই নাম রাখা হইয়াছে। মাডাগাস্কার দ্বীপে এক জাতীয় লেমুর বাস করে তাহাদের পা হাতের চাইতে লম্বা এবং কান অপেক্ষাকৃত ছোট। উহারা যখন মাটির উপর চলাফেরা করে তখন হাত দুইটি মাথার উপর তুলিয়া পিছনের পায়ের উপর ভর করিয়াই অগ্রসর হইয়া থাকে। উহাদের ল্যাজ দৈর্ঘ্য হিসাবে নানারকমেরই হইতে পারে।

লেমুর

মানুষের আকার, বিশেষভাবে তাহাদের দাঁত, নখ-সংযুক্ত অঙ্গুলী, বুড়ো অঙ্গুলী ইত্যাদির গঠন লক্ষ্য করিয়া দেখিলে মনে হয়, যে স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা লাঙ্গুলহীন বানর জাতিরই এক শ্রেণীভুক্ত ছিল। ল্যাজবিশিষ্ট বানর আবার সেই ল্যাজহীন বানরের পূর্ব্বপুরুষ। আকার, অস্থি-কঙ্কালের গঠন ইত্যাদি, পরীক্ষা করিলে সেই সলাঙ্গুল বানর লেমুর জাতীয় প্রাণী হইতেই যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আজকাল সকল জীবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া থাকেন। আবার কীট-পতঙ্গভুক্ (Insectivore) প্রাণীর সঙ্গে যে লেমুরের সম্বন্ধ আছে সে বিষয়েও তাঁহারা একমত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কীট-পতঙ্গভুক্ শ্রেণীর কোন
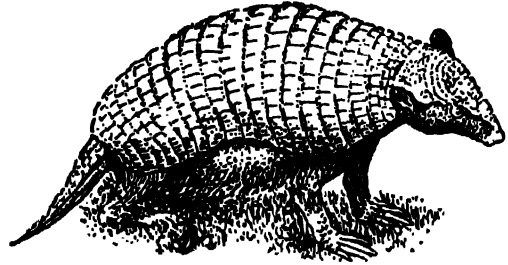
একটি কীট-পতঙ্গভুক্ প্রাণী—আরমাডিলো

হইতেই মানুষের উৎপত্তির সূত্রপাত হইয়াছিল। পতঙ্গভুক্ প্রাণী আকারে ছোট এবং চারিপায়ে দৌড়াইয়া চলাফেরা করিয়া থাকে। তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ খুবই কম। মাথায় অধিক পরিমাণ মস্তিষ্ক, কোন কিছু ধরার এবং করার উপযোগী হাতের গঠন ইত্যাদি যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তন্যপায়ী প্রাণীর (Primates) লক্ষণ তাহার সকলই মানুষেই বিশেষভাবে দেখা গিয়া থাকে। এখন এই ক্ষুদ্র পতঙ্গভুক্ প্রাণী হইতে মানুষের মত উচ্চস্তরের প্রাণীর উৎপত্তি যদিও তোমাদের ধারণারই অতীত, পণ্ডিতগণ এমনি ভাবে যুক্তিতর্কের দ্বারা এই মতের অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহাকে কোন মতেই নিতান্ত খামখেয়ালি কথা বলিয়া অবিশ্বাস করা চলে না।

গাছ থেকে নাম্‌রে বাঁদর
শুন্‌রে কথা শুন্‌রে শুন :—
বলত কি কেউ? জান্‌ত যদি
গাছে চড়ার কতই গুণ।

পণ্ডিতগণ এই পরিবর্ত্তনের বা ক্রমোন্নতির বহু কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে এই সকল ইতরপ্রাণীর বৃক্ষবাসের প্রয়াসকেই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন। পতঙ্গভূক শ্রেণীর কয়েকটি প্রাণীর যেমন টুপাইয়া (Tupaia) ও অন্যান্য গন্ধমূষিক জাতীয় প্রাণীর বৃক্ষবাসের চেষ্টা হইতেই এই পরিবর্ত্তনের সুরু হইয়াছে। বৃক্ষে জীবন যাপন করিতে হইলে তদনুযায়ী দেহের গঠন হওয়া দরকার। দেহের সকল অঙ্গ স্বচ্ছন্দ ভাবে নাড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। গাছে গাছে চলাফেরার সুবিধার জন্য লম্বা লম্বা হাত-পায়ের দরকার। তা ছাড়া ঘ্রাণশক্তির চাইতে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা, দূরত্বের পরিমাণ বুঝিবার বিশেষ ক্ষমতা ইত্যাদি অনেক কিছু থাকার দরকার। সেজন্য ভূতলবাসী পতঙ্গভুক্ হইতে বৃক্ষবাসী পতঙ্গভুক্ প্রাণীর মগজের পরিমাণ বেশী এবং দৃষ্টিশক্তিও তাহাদের চাইতে তীক্ষ্ণ। কিন্তু ভূতলবাসী পতঙ্গভুকের চাইতে

ঘ্রাণশক্তি তাহাদের কম, কেননা উহার এখন আর তেমন দরকার নাই। কোন কোন বিষয়ে লেমুরের সঙ্গে উহাদের এমনি কতকগুলি সাদৃশ্য আছে যে, তাহার জন্য বহু জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, তাহাদের চাইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত প্রাণীকেই লেমুরের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন।

টার্সিয়াস (Tarsius) নামক একটি ক্ষুদ্র প্রাণী আছে। সেই টার্সিয়াসের (Tarsius) নিকটজ্ঞাতি কোন প্রাণী হইতেই নাকি মানুষের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছিল। সাধারণ লেমুর কুকুরের মত ঘ্রাণশক্তির উপরেই বেশী নির্ভর করিয়া থাকে। তাই তাহাদের মুখের আকারও কতকটা কুকুরের মত; কিন্তু গোলমুখো লেমুর প্রধানতঃ দৃষ্টিশক্তির উপরই নির্ভর করে বলিয়া তাহাদের নাক খর্ব্ব হইয়া কতকটা বানরের মুখের মত হইয়া গিয়াছে। আর সাধারণ লেমুর মুখ দিয়াই খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু টার্সিয়াস (Tarsius) তাহার খাদ্য হাত দ্বারাই মুখে তুলিয়া দেয়। কোন কিছু দেখিবার জন্য সে তাহার মাথা এদিক সেদিক নাড়াচাড়াও করিতে পারে। এমন কি সম্পূর্ণ মুখই

টার্সিয়াস (Tarsius)

পিছনদিকে ফিরাইয়া লক্ষ্য করিতে পারে। চক্ষের ভিতরকার হলদে দাগ, যাহা দৃষ্টিশক্তির বিশেষ প্রমাণস্বরূপ, তাহা অপরিণত অবস্থায় হইলেও, উহাদের চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদের চাইতে উন্নত স্তরের প্রাণী,—বানর হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলের চক্ষেই এই হলদে দাগ সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়।

হাতে কোন কিছু ধরিবার এবং খাদ্য তুলিবার শক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে

স্পর্শ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা এবং উন্নততর মস্তিষ্ক গঠিত হইল। হস্তচালনার দক্ষতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তারপর হাতের স্পর্শশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দৃষ্টিশক্তি আসিয়া যোগদান করিল। তখনই তাহাদের বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটিল। কাল-ক্রমে চক্ষে দেখিয়া হাতে কাজ করিবাব যে ক্ষমতা তাহারা লাভ করিয়াছিল, উহা ক্ষুর কিংবা থাবা বিশিষ্ট কোন প্রাণীর পক্ষেই লাভ করা যে সম্ভবপর নয় তাহা তোমরাও বেশ অনুমান করিতে পার। এ সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা এটাও বেশ বুঝা যায় যে, উহাদের একদিকের উন্নতি অন্য দিকের উন্নতির কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এইরূপে মস্তিষ্ক, হাত, পা ও চক্ষু-প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমোন্নতির ফলে বৃক্ষবাসী পতঙ্গভুক্ ইতরপ্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া, লেমুর, কুকুরমুখো লেমুর, বানরমুখো লেমুর ইত্যাদি প্রাণীর ভিতর দিয়া অবশেষে বানর আকার গঠিত হইল। তারপর নানা বিষয়ে কৌতূহল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষবাস-কালে হাত-পায়ের সহজভাবে সঞ্চালনের দরকার হইয়াছিল। তাহাতে উহাদের আকারগত নানারকম পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। টার্সিয়াস জাতি যে উহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে উন্নততর দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার আরও উন্নতি হইল। বৃক্ষবাসে এই সকল প্রাণীর দৈহিক আকার, উন্নতির পথে ধীরে ধীরে কতটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহা এরপর তোমরা আরও দেখিতে পাইবে।

ক্রম-পরিবর্ত্তনের ফলে সাধারণ বানর হইতে ল্যাজহীন বানরের উদ্ভব হওয়াতে একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। বৃক্ষবাসী সলাঙ্গুল বানরগুলি আকারে খুব ছোট। তাহারা কাঠবিড়ালের মত ল্যাজ উঁচু করিয়া গাছের শাখাপল্লবের ভিতর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলাফেরা করে। সে সময় যাহাতে পড়িয়া না যায় তাহার জন্য, তাহাদের শরীরের ওজনের সমতা রক্ষা করিবার পক্ষে ঐ লাঙ্গুল তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। মাটিতে চলাফেরা করে বলিয়া তাহাদের একই শ্রেণীর বানর হনুমান (Baboon),

মেনড্রিল (Mandrill) আকারে বড় হয়। সলাঙ্গুল বৃক্ষবাসী বানর হইতে যে কোন লাঙ্গুলহীন বানর, এমন কি উল্লুক (Gibbon) পর্য্যন্তও আকারে বড়। মাটিতে চলাফেরা করে বলিয়াই তাহাদের আকার বৃদ্ধি হইবার সুযোগ পাইয়াছে। সেই একই কারণে অনাবশ্যক বলিয়া তাহাদের ল্যাজও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

হনুমান

বৃক্ষে বাস করিবার সময় তাহারা গাছের ডালপালার উপর দিয়া চলাফেরা না করিয়া, গাছের শাখা ধরিয়া সোজাভাবে ঝুলিতে ঝুলিতে এক গাছ হইতে অন্য গাছে চলাফেরা করিতে লাগিল। এই নূতন ভাবে চলাফেরা করাতে তাহাদের দেহের আরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সলাঙ্গুল বানরের বুক বিস্তৃত না হইয়া ভিতর দিকে ঢুকান থাকে, কিন্তু ঝুলান ভাবে ডালপালার ভিতর দিয়া যাতায়াত করাতে ল্যাজহীন বানরের বুক প্রশস্ত আকার ধারণ করিল। এই একই কারণে, তাহাদের হাতে ধরিবার এবং স্পর্শ দ্বারা জিনিষের আকার বুঝিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ঝুলান অবস্থায় দোল দিতে দিতে এক ডাল হইতে অন্য ডালে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময়, চক্ষু এবং হাতের একই সময়ে কতটুকু ক্ষিপ্রকারিতার প্রয়োজন তাহা তোমরাও বুঝিতে পার। ফলে তাহাদের চক্ষু এবং হাতের একযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছিল। আর এইরূপে তাহাদের দেহ স্বভাবতঃ গাছের ডালে ঝুলান অবস্থায় থাকাতে আর একটা সুবিধা এই হইল যে, তাহাদের যখন মাটিতে নামিতে হইল তখন তাহাদের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধা রহিল না।

এখন ভাবিয়া দেখ, নানাভাবে বৃক্ষজীবন যাপন দ্বারা বিভিন্ন আকারের বানর-দেহ গঠন বিষয়ে কতটা সাহায্য হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, মানুষের পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে সলাঙ্গুল ও লাঙ্গুলহীন বানরের আকারে বৃক্ষবাস না করিলে কখনই এই মানুষের আকার প্রাপ্ত হইত না। এমন কি তাহারা তাহাদের যে বুদ্ধিবৃত্তি এবং মনুষ্যত্বের জন্য আজ সকল প্রাণীর উপরে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাও তাহাদের বৃক্ষজীবনের শিক্ষানবীশি হইতেই লাভ করিয়াছে। শুধু পায়ের উপর ভর করিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইয়া গমনাগমন করা, বিবিধ ভাবে হাতের কাজ করা প্রভৃতি মানুষের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি যে বৃক্ষবাসেই হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় তোমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছ।

আমেরিকার জঙ্গলে যে
ল্যাজহীন কপি চরে—
সম্প্রতি তা জানা গেছে
অনেক দিনের পরে।

সলাঙ্গুল বানরের একটি শাখা দক্ষিণ আমেরিকাতে বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহা হইতেই তথাকার মারমোসেট্ (Marmoset) নামক ক্ষুদ্রকায় বানর, দীর্ঘলাঙ্গুল বানর (Spider monkey), লোমবহুল বানর (Woolly monkey) ও হুক্কু (Howler) নামক চিৎকারকারী বানর প্রভৃতি নানা রকমের বানরের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্যান্য দেশের বানর হইতে আমেরিকার বানরের কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে। উহাদের নাকের ছিদ্র পরস্পর অপেক্ষাকৃত দূরে দূরে অবস্থিত। গালের ভিতর খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার মত উহাদের কোন থলে থাকে না। উহারা উহাদের ল্যাজ, হাত-পায়ের মত কোন কিছুতে জড়াইয়া ঝুলিয়া থাকিতে পারে। তা ছাড়া দাঁত এবং নাকের গঠন ইত্যাদিতে মানুষের চাইতে প্রাচ্য দেশবাসী বানরদিগের সঙ্গেই উহাদের সাদৃশ্য বেশী।

কিছুকাল পূর্ব্বেও দক্ষিণ আমেরিকাতে ল্যাজহীন বানর নাই বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। দক্ষিণ আমেরিকাতেও যে সলাঙ্গুল বানর হইতে ক্রমোন্নতির ফলে লাঙ্গুলহীন বানরের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভেনিজুলার (Venezula) জঙ্গল হইতে সংগৃহীত খুব বড় লাঙ্গুলহীন একটি বানরের ফটো প্রথমতঃ প্রকাশিত হয়। উহা সেই প্রাণীর সম্মুখদিকের ছবি। তাহা হইতে উহা আকারে কত বড় এবং লাঙ্গুলহীন কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। সম্প্রতি একদল অনুসন্ধান-কারী, দক্ষিণ আমেরিকার টারা (Tarra) নদীর নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে অনুসন্ধান-কালে এরূপ দুইটি বানরের দেখা পান। যখন তাঁহাদের অনুসন্ধানের কাজ চলিতে-ছিল তখন এই দুইটি বানর গোপনীয় স্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণের ভয় দেখায়। তাঁহারা গুলি করিয়া তাহাদের মধ্যে একটিকে বধ করেন এবং পরে দেখা গেল যে, উহা একটি সম্পূর্ণ নূতন আকারের ল্যাজহীন বানরী। উচুতে উহা পাঁচ ফুটের উপর অর্থাৎ একজন মানুষের সমান। এই

দক্ষিণ আমেরিকাতে প্রাপ্ত এবং গুলির আঘাতে মৃত ল্যাজহীন বানরী (ছায়াচিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত)

আবিষ্কার হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় ক্রমোন্নতির ফলে, সলাঙ্গুল বানর হইতে যে নূতন লাঙ্গুলহীন বানরের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। যদিও ইহা সত্য যে, কোন লাঙ্গুলহীন বানর হইতেই মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, তথাপি এই দক্ষিণ আমেরিকাবাসী প্রাণী হইতে যে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে তাহা কিন্তু মনে করা ভুল।

হাতী, ঘোড়া, গণ্ডার প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষের নানা আকারের কঙ্কাল পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা বুঝিবার যেরূপ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, মানুষের ক্রমোন্নতির ধারা বুঝিবার সেরকম সুযোগ খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। আজকাল মানুষ যেমন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বিস্তৃতভাবে বাস করিতেছে, বিশ পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের সেরূপ অবস্থা ছিল না। ইহার পূর্ব্বকার কতকটা মানবাকৃতি জীবের, মাত্র সামান্য কয়েকটি দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আজকাল গরিলা প্রভৃতি অতিকায় লাঙ্গুলহীন বানর যেমন সংখ্যায় নিতান্ত কম, এবং তাহারা যেমন বন্য জীবন যাপন করে, অতীতে তথাকথিত মানুষের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। অধিকন্তু তখন তাহাদের দেহ শিলীভূত হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম ছিল।

আজকাল অনুসন্ধানের ফলে কত শত শত প্রাণীর দেহাবশেষ ভূগর্ভ হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে; কিন্তু বিগত একশত বৎসর পূর্ব্বের গরিলা, শিম্পাঞ্জি কিংবা ওরাংওটাং-এর কোন চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। উহারা সকলেই বন্য জীবন যাপন করে বলিয়া উহাদের মৃতদেহ বেগবান নদীর স্রোত, হ্রদ, সাগর ইত্যাদি যাহার স্তরের ভিতরে প্রাণিদেহ শিলীভূত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তেমন জায়গায় পতিত হয় নাই। সেই একই কারণে আমাদের বুনো পূর্ব্বপুরুষেরও দেহাবশেষ সহসা শিলীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। সেই জন্য ইতরপ্রাণী হইতে মানুষের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করার অসুবিধা যে কি তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। এ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান ও অধ্যবসায় বলে এসম্বন্ধে যে সকল

তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত কম নহে। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমানের কোন লাঙ্গুলহীন বানরই মানুষের পূর্ব্বপুরুষ নয় এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে আবিষ্কৃত লাঙ্গুহীন বানরকেও মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে পারে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শিবালিক পাহাড়ের স্তর অনুসন্ধানকালে পিলগ্রিম (Pilgrim) সাহেব শিবাপিথিকাস (Sivapithecus) নামক একটি ল্যাজহীন বানরের নীচের চোয়াল পাইয়াছিলেন। উহার আকার অনেকটা মানুষের মত ছিল বলিয়া মনে হয়। শিলীভূত কিংবা জীবন্ত, কোন ল্যাজহীন বানরের সঙ্গেই উহার সাদৃশ্য নাই। উহার চর্ব্বণ-দন্তগুলি মানুষের মত হইলেও শ্বদন্ত আবার সম্পূর্ণ ল্যাজহীন বানরের মত। সেজন্য উহাকে বানরের সঙ্গেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। মানুষের চোয়ালের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য থাকাতে কেহ কেহ আবার উহাকে মানুষ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সে যাহা হউক, উহা
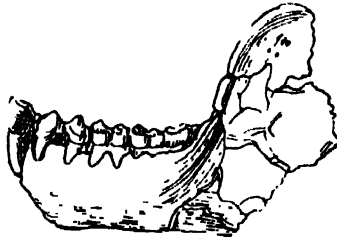
প্রোপ্লিওপিথিকাস
(Propliopithecus)

লুপ্ত বানরের চোয়ালের ছবি

যে কতকাংশে মানুষের মত, এবং ল্যাজহীন বানরের চাইতে উন্নততর প্রাণী, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। উহার এই চোয়াল কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। প্রপ্লাওপিথিকাস্ (Propliopithecus) ও প্লাওপিথিকাস্ (Pliopithecus) নামক অন্য আরও দুইটি লুপ্ত বানরের চিহ্ন পৃথিবীর স্তরের ভিতর পাওয়া গিয়াছে

আস্ত ভাঙ্গা মাথার খুলি
গুটি কয়েক হাড়
পুরাকালের নর-বানরের—
খুঁজে হইল বা'র।

নরাকার বানর হইতে সম্পূর্ণ মানবাকার জীবের উৎপত্তি হইতে, এই উভয়ের মধ্যে ক্রমোন্নতির দরুণ যে সকল প্রাণীর আবির্ভাব এবং তিরোভাব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রাণীর মাথার খুলি ও কঙ্কালের অংশ পৃথিবীর প্রাচীন স্তর হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। পৃথিবীর স্তরে উহাদিগের দেহাবশেষ কেন যে কম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পৃথিবীর নিম্ন ইওসিন (Lower Eocene) স্তরে লেমুরের মত নানা আকারের প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই স্তরে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা কিংবা অষ্ট্রেলিয়া-বাসী কোন বানরেরই দেহের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। আপার ইজিপ্টের (Upper Egypt) নিম্ন ওলিগোসিন (Lower Oligocene) স্তর হইতে প্রাপ্ত প্রপ্লাওপিথিকাস্ (Propliopithecus) নামক যে লাঙ্গুলহীন বানর-দেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এই শ্রেণীর খুবই প্রাচীন বানরের উদাহরণ। মাওসিন (Miocene) যুগের শেষের দিকে ইহার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রাচীন যে সকল বানরের দেহ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্লাওপিথিকাস্ (Pliopithecus), আধুনিক উল্লুক (Gibbon) ও ড্রাইওপিথিকাস্ (Dryopithecus) অন্যান্য লাঙ্গুলহীন বানরের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে হয়।

শেষোক্ত প্রাণীর সম্পূর্ণ খবর তাহার শিলীভূত দাঁত, চোয়াল এবং মাথার খুলির খণ্ড খণ্ড অংশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। উহারা প্রাচীন যুগের পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বিচরণ করিত। ল্যাজহীন বানর হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেরই উহারা আদি। উহাদের সঙ্গে মানুষের পূর্ব্বপুরুষের খুবই সাদৃশ্য ছিল। মানুষ, গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং ওরাঙ্-ওটাঙএর আদিপুরুষের দাঁত এবং চোয়াল যেরূপ হইবে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন, উহাদের দাঁত ও চোয়াল তদ্রূপই দেখা গিয়া থাকে।
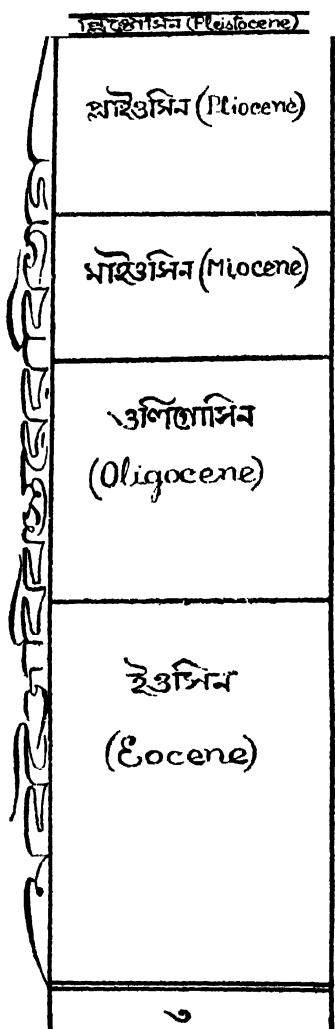
বর্ত্তমানের বৃহদাকার কোন লাঙ্গুলহীন বানরের শিলীভূত দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্ট্রেলোপিথিকাস্ (Australopithecus) নামক একটি মাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক ল্যাজহীন বানরের শিলীভূত মাথার খুলি, বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানালেণ্ডের (Bechuanaland) অন্তর্গত টংসে (Taungs) পাওয়া গিয়াছে। তাহার দাঁত এবং থুত্নির আকারের দরুণ বানরের চাইতে মানুষের সঙ্গেই উহার সাদৃশ্য বেশী বলিয়া মনে হয়।

এই সকল প্রাণীর ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে সংক্ষেপে তাহা বলা হইল। ইহা হইতেই তোমরা এবিষয়ের একটা ধারণা করিতে পারিবে।

পৃথিবীর যে যে স্তরে এই সকল প্রাণীর শিলীভূত দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ।

পরিবর্ত্তনানুযায়ী প্রাণীর বিবরণ	সময় ও স্তরের বিবরণ
১। পতঙ্গভুক্ প্রাণী হইতে লেমুর জাতীয় প্রাণী।	ক্রিটেসিয়াস (Late Cretaceous) স্তর গঠনের শেষের দিকে।
২। লেমুর হইতে সলাঙ্গুল বানর।	ইওসিন (Eocene) স্তর গঠনের প্রারম্ভে।
৩। বানর হইতে লাঙ্গুলহীন বানর।	ইওসিন যুগের শেষের দিকে, উষ্ণ অরণ্যের ভিতর।
৪। লাঙ্গুলহীন বানরের বিভিন্ন আকার।	ওলিগোসিন (Oligocene) এবং মাইওসিন (Miocene) এই উভয় যুগ ব্যাপিয়া।
৫। উহা হইতে মানুষাকার প্রাণীর শাখার আবির্ভাব।	মাওসিন যুগের শেষের দিক, পূর্ব্ব অথবা মধ্য প্লাওসিন (Pliocene) যুগের পর।

শাখামৃগ নাম বানরের
বাস করিত গাছে,
ভূচর হ'তে ইচ্ছা তাদের
হইল কেন পাছে?

সলাঙ্গুল এবং লাঙ্গুলহীন বানরের আকার অতিক্রম করিয়া মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে এবং সেজন্যই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। মানুষের পূর্ব্বপুরুষের বৃক্ষ হইতে কেন যে ভূতল-বাসের ইচ্ছা অথবা আবশ্যক হইয়াছিল তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়। আকারবৃদ্ধিও

ইহার একটি কারণ হইতে পারে। বৃদ্ধ পুরুষ-গরিলার বৃহৎ আকার এবং ওজনের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এরূপ বৃহৎ আকার নিয়া বৃক্ষে জীবন-যাপন তেমন সুবিধাজনক নয় বলিয়াই পুরুষ-গরিলা সচরাচর মাটিতেই বাস করে, কিন্তু সামান্য রাগের কারণ ঘটিলেই গাছের উপর উঠিয়া পড়ে। দেহের বৃদ্ধিই যে উহাদের ভূতলবাসের একমাত্র কারণ তাহা নহে। অন্যান্য কারণও ছিল, যাহার জন্য এই সকল প্রাণীকে বৃক্ষ ছাড়িয়া ভূতলে নামিতে হইয়াছিল।

খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কারণে বাধ্য হইয়া উহাদিগকে বৃক্ষবাস পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়া থাকেন। ইহার আর একটি কারণ যাহা অনুমান করা হইয়াছে তাহা বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। মাইওসিন (Miocene) যুগের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নবজৈবিক (Cainozoic) যুগ অতিক্রম করিয়া তুষার যুগ (Ice Age) পর্য্যন্ত পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমেই শুষ্ক এবং শীতল হইতেছিল। তাহাতে বহু গাছপালার মৃত্যু হইয়া জঙ্গলের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল। প্রায় সকল স্থানেই, জঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অধিবাসিগণও স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। মধ্য-এসিয়ায়, হিমালয়ের উত্তরদিকে, বন-জঙ্গল যখন ধ্বংসমুখে পতিত হইল, তখন তাহার ভিতরকার প্রাণিগণ, অন্যান্য জায়গার মত, সু-উচ্চ পর্ব্বত এবং উপত্যকা অতিক্রম করিয়া, দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তখন তাহাদিগকে মুক্ত ভূভাগের উপর বসবাসের ব্যবস্থা করিতে হইল। সেই অসাধারণ পরিবর্ত্তনে বনচর লাঙ্গুলহীন বানর হইতে জীবন-সংগ্রামের ফলে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর অন্যান্য স্থানে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হওয়ার পক্ষে, এরূপ কোন অন্তরায় না থাকাতে এই বনচর জীবের দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে আর কোন অসুবিধা হয় নাই। ফলে তথাকার লাঙ্গুলহীন বানর-বানরই রহিয়া গেল।

এই কারণে কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধ্য-এসিয়াতেই মানবের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে

তাহা সত্য হইলে, এই অনুমান যে যুক্তিসঙ্গত তাহা তোমরাও বুঝিতে পার। ইহা খুবই সম্ভব যে, অতীত যুগে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ, অরণ্যপ্রান্তবাসী তাহার অন্যান্য ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিদের চাইতে ভূতল-বাসই বেশী পছন্দ করিত। তাহাতেই তাহার বৈশিষ্ট বিশেষভাবে বিকাশ পাইয়াছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মস্তিষ্কবিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ মানুষ নামে পরিচিত হইয়াছিল। সলাঙ্গুল বানরের মধ্যে হনুমান এবং তাহার অন্যান্য জ্ঞাতিগণ বৃক্ষবাস পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা যে অন্যান্য সলাঙ্গুল বানর হইতে বিশেষ বুদ্ধিমান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মানুষের পূর্ব্বপুরুষ সম্পূর্ণ মানবাকার লাভ করিবার পূর্ব্বে কি আকারের ছিল সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহা অনুমান করেন—তাহার কথাই এখন তোমাদিগকে বলা হইবে। বহু অনুসন্ধান এবং গবেষণার পর তাঁহারা ঠিক করিয়াছেন যে, সেই মানবাকৃতি জীবের দেহ রোমের দ্বারা আবৃত ছিল। সেই রোমের রং সম্ভবতঃ কাল ছিল, লালও হইতে পারে। হাত ও হাতের আঙ্গুল বর্ত্তমানের চাইতে লম্বা ছিল। পা দুইটি বাঁকা ও খাট বলিয়া আকারে খাট দেখাইত। বসিয়া থাকিবার সময় যাহাতে পা দিয়া গাছের ডাল ধরিয়া রাখিতে পারে তাহার জন্য পায়ের পাতা নীচের দিকে বাঁকান ছিল।

মস্তিষ্কের পরিমাণবৃদ্ধিই তারপর মানবের ভবিষ্যৎ ক্রমিক উন্নতির প্রধান কার্য্যরূপে দেখা দিয়াছিল এবং এই উন্নতি নানা উপায়ে সাধিত হইয়াছিল। গাছের এক শাখা হইতে ভিন্ন শাখাতে যাওয়ার জন্য যেরূপভাবে হাতের ব্যবহার করিতে হইত, ভূতলবাসে আর সেরূপভাবে ব্যবহারের দরকার রহিল না। এখন তাহারা অস্ত্র তৈয়ার, অস্ত্রের ব্যবহার, কাঠ-পাথর বহন ইত্যাদি কার্য্যে দরকারমত হাতের ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহাতে হাতের গঠনের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। অন্যদিকে বৃক্ষবাসের দরুণ বৃক্ষারোহণের শক্তি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকা দরকার, ভূতলবাসে সে সকল গুণ তাহাদের কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া

গেল। আর বৃক্ষবাসকালে তাহারা কেবল গাছের ফল খাইয়াই জীবন-ধারণ করিত, কিন্তু ভূতলবাসে তাহারা সর্ব্বভুক্ হইয়া পড়িল এবং শিকারের দিকে মন দিল। তাহাতেও তাহারা বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দৃষ্টিশক্তিরও উন্নতি হইল। ভূতলবাস এবং শিকারের দরুণ বিপদের বৃদ্ধি হওয়াতে, সমশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর জানাশুনা ও সাহায্যের দরকার হইল; তাহা হইতেই ভাষা এবং ভাবের উৎপত্তি। মানুষের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত
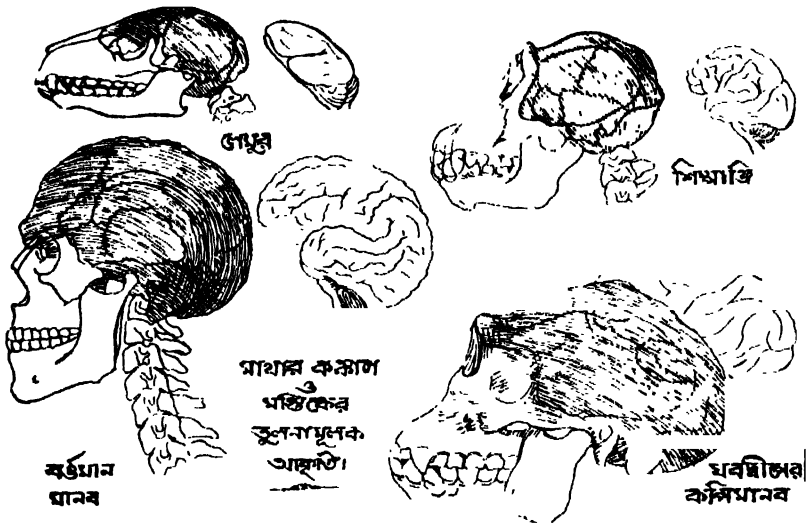
মাথার কঙ্কাল ও মস্তিষ্কের তুলনামূলক ছবি

করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের দৈহিক অস্ত্র দাঁত, নখ ইত্যাদির প্রয়োজন ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। তাহাতে দাঁত ও নখের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মানুষ তখন উপর নীচের চোয়াল এদিক্ সেদিক্ নাড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা লাভ করিল। এমন কি তাহাতে মুখের মাংসপেশীরও পরিবর্ত্তন হইয়া উহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া গেল, বাড়ান চিবুক ছোট হইয়া মুখের ভিতর ঢুকিয়া গেল। দাঁত দ্বারা ভীষণভাবে আক্রমণ ও দংশনের কাজ

কমিয়া যাওয়াতেই এই পরিবর্ত্তন। ইহাতে মুখে শব্দ উৎপাদনের সাহায্যকারী মাংসপেশীর সামান্য সামান্য সঙ্কোচও সম্ভবপর হইল। এই সকল পরিবর্ত্তনে আবার মস্তিষ্কবৃদ্ধির পক্ষেও সাহায্য করিয়াছিল।

মানব-শিশুকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দীর্ঘকাল মায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। মাতার পক্ষে সন্তান সঙ্গে করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া মাতাপিতার মধ্যে কাজের বিভাগ হইয়া গেল। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য হইলেও একটা বাসস্থান নির্দ্দেশ করার দরকার বোধ হইল। পিতা শত্রুর সহিত যুদ্ধ ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার করিবে, আর মাতা গৃহ রক্ষা করিবে। ইহাতে মাতা ও সন্তানের মধ্যে স্নেহবন্ধন দৃঢ়তর হইল এবং পরিবার-গঠনের সূত্রপাৎ হইল।

আদি মানব নয়ত বহু—
মোটে কয়েক জন,
স্তরের মাঝে চিহ্ন খুঁজে
হইল নিরূপণ।

প্রাগৈতিহাসিক শিলীভূত নরবানরাকৃতি জীব, আজ পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পিথেকেন্‌থ্রপাস্ (Pithecanthropus), সিনান্‌-থ্রপাস্ বা চীনা মানব, (Sinanthropus or Peking Man) হিডেলবার্গ মানব (Heidelberg Man), পিল্টডাউন মানব (Piltdown Man), নিএন্‌ডারথেল্ মানব (Neanderthal Man), রোডেসিয়া মানব (Rhodesian Man) প্রভৃতির কথা আজকাল সকল প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের নিকটেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইহাদের বিষয় আজ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে এখানে বলা হইল। উহাদের মধ্যে পিথেকেনথ্রপাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আদি মানব বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তাহার কথাই প্রথম বলা হইল।

এই মানচিত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও তদপেক্ষা আধুনিক মানবের বাসস্থান তারকা চিহ্নিত স্থানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শি—শিবালিক পাহাড়; ৯ নম্বর তারকাচিহ্নিত স্থানে পিকিং মানবের বাসস্থান; ট, টংস; ৮ নম্বর পিল্টডাউন এবং ৭ নম্বর রোডেসিয়া নামক প্রাচীন মানবের বাসস্থান তারকা চিহ্নিত স্থানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১০ নম্বর তারকাচিহ্নিত স্থানে পিথেকেন্থ্রপাস, কপি-মানবের বাসস্থান। ১, ২, ৩, ৪, ৫,৬ নম্বর তারকাচিহ্নিত স্থানে উহাদের চাইতে আধুনিক নিএন্ডারথেল মানবের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

কপি-মানব

পিথেকেন্থ্রপাস্ (Pithecanthropus)

পিথেকেন্থ্রপাসের অর্থ সোজাভাবে দাড়ানে সমর্থ কপি-মানব. যে কয়েকটি শিলীভূত বানরাকৃতি মানবের অস্থিকঙ্কাল আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পিথেকেন্থ্রপাস্‌কে বৈজ্ঞানিকগণ আদি মানবের সঙ্গে

পিথেকেন্থ্রপাসের মুখের আনুমানিক আকৃতি

স্থান দান করিয়াছেন। সেই হিসাবে এবং অত্যন্ত প্রাচীন আদি মানব বলিয়া উহার কথা তোমাদের নিকট কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলা হইল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইউজিন ডুবোয়া (Eugine Dubois) নামক একজন ওলন্দাজ ডাক্তার যবদ্বীপের স্তরসমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক

নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার এই পরিশ্রম যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল। যবদ্বীপের স্তরসমূহে তিনি যে কেবল এই কপি-মানবেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা নহে; অতীতের বহু অজ্ঞাত প্রাণীর দেহাবশেষও তাহাদ্বারা সেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই কপি-মানবের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা এখানে শুধু তাহারই কথা আলোচনা করিব। কতিপয় অস্থিখণ্ড পাইয়া শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই যে তিনি উহাকে এই স্থান দিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার এই মতের অনুকূলে তিনি কতকগুলি কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মোটামুটি ভাবে তাহা তোমাদের জানা দরকার।

তিনি কেন, আজ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেরই মত এই যে, পিথেকেন্থ্রপাস্ ল্যাজহীন বানর ও মানবের মাঝামাঝি প্রাণী। এমন কি ক্রম-বিবর্ত্তনবাদের মতে প্রাণীর ক্রমোন্নতির পথে উহাকে মানবের অগ্রদূত বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। উহার মাথার খুলির আকার যে কোন ল্যাজহীন বানরের মাথার খুলির তুলনায় এবং নিজের দেহের অনুপাতে বেশ বড়। অবশ্য মানুষের মাথার খুলি তাহার দেহের অনুপাতে স্বভাবতঃ সচরাচর যে পরিমাণে বড় হইয়া থাকে, তাহার চাইতে তুলনায় যে ছোট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহার মস্তিষ্কের আধার দেখিয়া উহাতে মানুষের তুলনায় মস্তিষ্ক যে দুই তৃতীয়াংশের বেশী ছিল না তাহা বেশ বুঝা যায়। মাথার খুলি পিছনদিকে ল্যাজহীন বানরের চাইতে হেলানভাবে বেশীর ভাগ বাড়ান ছিল; সুতরাং মস্তিষ্কের পরিমাণও বেশী ছিল। এই সকল প্রাণীর দাঁতের সঙ্গে উহার দাঁতের সাদৃশ্য কম, বরং প্রাচীন মানবেরই মত। অধিকন্তু ঊরুর হাড় মানুষেরই মত দীর্ঘ এবং সোজা হইয়া চলাফেরা করার সম্পূর্ণ উপযোগী। তাহাকে মানবের আসনে স্থানদানের ইহাই প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষের শিবালিক পাহাড়ের স্তর খননের ফলে যে সকল অতীতের প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে ডুঁবোয়া সাহেবের যবদ্বীপে

প্রাপ্ত নানা রকম প্রাণীর দেহাবশেষের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। তাহাতে শিবালিক পাহাড় ও ত্রিনীলের যে স্তরে কপি-মানবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এই উভয় স্থানের স্তরকেই তিনি প্লাইওসিন যুগের উপরকার স্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন যুগে যবদ্বীপ এসিয়া মহাদেশের সংলগ্ন একটি অংশ-বিশেষ ছিল। তখন হয়ত হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে যবদ্বীপের অন্তর্গত ত্রিনীল গ্রামের নদীতীর পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগে প্রাণী সকল অবাধে বিচরণ করিত। আর এই কপি-মানবের দলও তখন এই ভূভাগের উপর উৎপন্ন জঙ্গলের ভিতর বাস করিত।

ওরাঙ্‌ওটাঙ্‌ যাহা এখন মাত্র বোর্‌নিও দ্বীপেই দেখিতে পাওয়া যায় উহাও সেই যুগেই তথায় স্থান লাভ করিয়াছিল। তারপর বোর্‌নিও দ্বীপ এসিয়া মহাদেশ হইতে পৃথক্‌ হইয়া যাওয়াতে এখন উহাদের শুধু সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের প্লাইওসিন্‌ যুগের উপরকার স্তরে এই একটি মাত্র ল্যাজহীন কপিরই চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের ফলে, যবদ্বীপের মত ভারতেও এই কপি-মানবের আরও দেহাবশেষ তোমাদের কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হইবে। এই আদি মানবের দেহের অন্যান্য অংশ সংগ্রহ করিবার জন্য যে চেষ্টা করা হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের ফলে ডুঁবোয়া সাহেবের আবিষ্কৃত কয়েকখণ্ড অস্থি ছাড়া, উহার আর কোনও অংশ আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করা যায় নাই। জনৈক জার্ম্মাণ প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ সেলেঙ্কার (Mr. Selenka) বিধবা পত্নী বহু অর্থব্যয় করিয়া পুনরায় যবদ্বীপে অনুসন্ধানকার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রমাগত আঠার মাস অনুসন্ধানের পরেও এসম্বন্ধে নূতন কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

পরবর্ত্তী সময়ে সংগৃহীত প্রাচীন নিএন্‌ডার্‌থেল মানবের মাথার খুলির সঙ্গে উহার মাথার খুলির সাদৃশ্য খুব বেশী; বর্ত্তমানে যে কোন ল্যাজহীন বানরের মাথার খুলির সঙ্গে তুলনা করিলে, উহা যে তাহাদের চাইতে আকারে

খুবই ভিন্নরকমের তাহা বুঝা যায়। বর্ত্তমানের সকল ল্যাজহীন বানরের মাথার খুলি যেরূপ বিস্তৃত তাহার তুলনায় উহাকে বেশ অপ্রশস্ত দেখায়।
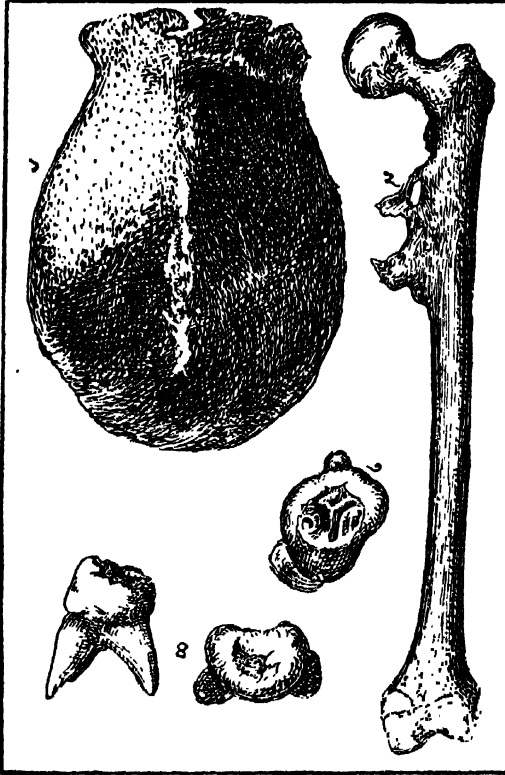
যবদ্বীপে প্রাপ্ত পিথেকেন্থ্রপাসের কঙ্কালের বিভিন্ন অংশ
১। মাথার খুলি ২। উরুর হাড়
৩। উপরের চোয়ালের দক্ষিণ প্রান্তের আক্কেল দাঁত (Wisdom tooth)
৪। উপরের চোয়ালের দক্ষিণ প্রান্তের তৃতীয় চর্ব্বণদন্ত, খাড়া ও শয়ান ভাবে।

পিথেকেন্থ্রপাস্ যে মানব এবং ল্যাজহীন বানরের মাঝামাঝি আকারের মানুষ ছিল, এবিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। কেননা সম্পূর্ণ বানর কিংবা মানুষ উহাকে কখনই বলা চলে না। যদি কেবল মাথার খুলি এবং দাঁত পাওয়া যাইত তবে তাহা দেখিয়া উহাকে একটি খুব বড় রকমের ল্যাজহীন বানর বলা চলিত। আর যদি কেবল উরুর হাড়ই পাওয়া যাইত তবে উহাকে মানুষ বলিয়া ধরাই খুব স্বাভাবিক হইত। কিন্তু এই সকল অস্থিখণ্ড একই প্রাণীর হইলে তাহাকে নর-বানরের মাঝামাঝি প্রাণী ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। পিথেকেন্থ্রপাসের দেহের অন্যান্য আরও অংশ আর কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হইলেই সবরকম সন্দেহের শেষ হইত। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, এ সন্দেহের একদিন সমাধান হইবে।

উহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে, উহা হইতেই যে মানুষের সাক্ষাৎভাবে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কেহই স্বীকার করিতে চান না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উহা মানুষের অতি-বৃদ্ধ পিতামহ না হইলেও যে অতি-বৃদ্ধ-খুল্ল-পিতামহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকদিগের মতেই উহা মানুষের পূর্ব্বপুরুষের একটি বিলুপ্ত শাখা। উহার কোন বংশধরই এখন আর জীবিত নাই। ড্‌'বোয়া সাহেবের এই আবিষ্কার জগতে এক নবভাবের সৃষ্টি করিয়াছে।

১৯৩১ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, এই দুই বৎসরের মধ্যে যবদ্বীপে, আরও কয়েকটি প্রাচীন মানবের মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের নাম রাখা হইয়াছে যাভান্‌থ্রপাস্ (Javanthropus)। এছাড়া পূর্ব্ব-আফ্রিকাতেও সম্প্রতি আরও কয়েকটি মাথার খুলি আবিষ্কার করা হইয়াছে। যতটা বুঝা যায়, তাহাতে উহাদের আকার অনেকটা আধুনিক মানবের মত ছিল। সম্ভবতঃ উহারাই প্রথমতঃ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করে। উহারা পিথেকেন্‌থ্রপাস্ এবং নিএন্‌ডারথেল মানবের মাঝামাঝি সময়কার মানব বলিয়া অনুমান করা হয়।

চীনের কপি-মানব

(Sinanthropus or Peking Man)

যবদ্বীপের কপি-মানব পিথেকেন্‌থ্রপাসের মত, প্রাচীনতম যুগের বানরাকৃতি মানবের মাথার কঙ্কাল, কিছুদিন হয় চীনদেশে পাওয়া গিয়াছে। ডেভিড্‌সন ব্লেক্ (Davidson Black) নামক একজন সাহেব চীনদেশে পিকিন্ সহরের নিকটবর্ত্তী চুঁ-কুঁ-থিন্ (Chou Kou Tien) নামক স্থান হইতে, এই বানরাকৃতি মানবের মাথার সম্পূর্ণ খুলি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর

মাসে সাধারণের নিকট প্রচার করেন। সেই মাথার খুলির যথাযথ আকৃতি কলিকাতা যাদুঘরের ভূতত্ত্ববিভাগে সযত্নে রক্ষিত আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর আগেকার বানরাকৃতি মানবের এই মাথার খুলি যাদুঘরে তোমরা দেখিও। যে স্তরে উহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উহা, যবদ্বীপের কপি-মানব ও হিডেলবার্গ

চীনের কপি-মানবের আনুমানিক আকৃতি

মানবের পরবর্ত্তী এবং ইউরোপের পিল্টডাউন মানবের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রাচীন প্লিষ্টোসিন্ (Plicstocene) যুগে এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বভাগে কি আকারের মানবজাতি বাস করিত এই পিকিন্ মানব তাহারই উদাহরণ। যবদ্বাপের মানুষের মাথার খুলির সঙ্গে উহার মাথার খুলির বেশ সাদৃশ্য আছে। তাহাতে উহা অন্যান্য শিলীভূত মানবের চাইতে যবদ্বীপের

মানবেরই সমধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। উহার চোয়ালের গঠনে নর এবং বানর উভয়েরই লক্ষণ আছে। কোন কোন বিষয়ে বর্ত্তমান মানবের দাঁতের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহার জন্য ইউরোপের নিএন্ডারথেল্ মানবের সঙ্গেও উহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। উহার মস্তিষ্কের পরিমাণ কিন্তু খুবই কম ছিল। মস্তিষ্কের আধারে উহা যে পরিমাণ মগজ ধারণ করিতে পারিত তাহা, অন্যান্য মানবের তুলনায় কম হইলেও যবদ্বীপের মানবের চাইতে যে বেশী ছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। মাথার খুলি,
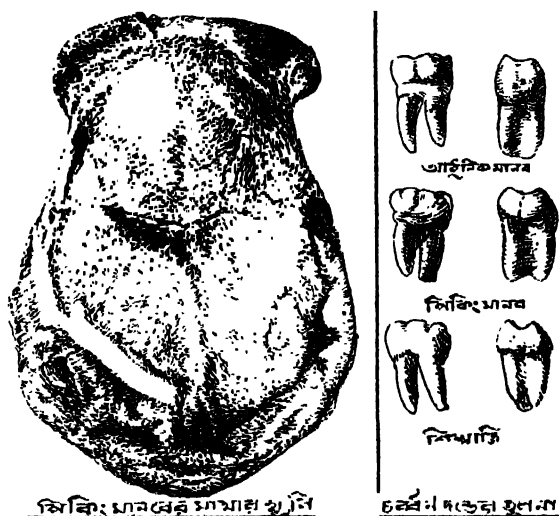
পিকিং মানবের মাথার খুলি ইত্যাদি

মস্তিষ্কের আধার, দাঁতের গঠন ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া কিথ্ (Keith) সাহেব মানবজাতির ক্রমোন্নতির পথে, যেস্থানে এই জাতির উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেস্থান হইতেই যাভা মানব, নিএন্ডারথেল্ মানব ও বর্ত্তমান মানবের পূর্ব্বপুরুষ পৃথক্ হইয়াছে। কপি-মানব ও তাহাদের পরবর্ত্তী যুগে উৎপন্ন মানবের সঙ্গে, বর্ত্তমান মানবজাতির মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ

তাহা বুঝাইবার জন্য যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলেই তোমরা এবিষয় আরও ভালরূপে বুঝিতে পারিবে।

চীনের কপি-মানবের যা চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া যাভাতে প্রাপ্ত কপি-মানবের পূর্ব্বে কিংবা পরে, কখন উহা পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তাহা নির্ণয় করা যদিও কঠিন, তবুও চীনের কপি-মানব যে খুবই প্রাচীন শ্রেণীর মানব সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এই কপি-মানবের দেহাবশেষ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে যা অনুমান হয়, তাহাতে মনে হয় যে, উহা মানব হইলেও অনেকাংশে বানরেরই মত আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। বর্ত্তমান মানবের পূর্ব্বপুরুষের খুব নিকটবর্ত্তী মানবশাখা হইতেই উহার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই পণ্ডিতদিগের অনুমান। চুঁ-কুঁ-থিনের যে গুহা হইতে উহার দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই কয় বৎসর যাবৎ যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু কোন অস্ত্রশস্ত্রের চিহ্ন উহাতে পাওয়া যায় নাই; তাহাও উহার প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন। অস্ত্র পাইলে তাহা দ্বারা উহার সময় নির্দ্ধারণের সুযোগ পাওয়া যাইত।

হিডেল্‌বার্গ মানব

(Heidelberg Man)

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে, এই আশ্চর্য্য প্রাচীন মানবের শিলীভূত হাড় ও নীচের চোয়াল জার্ম্মেণীর অন্তর্গত হিডেল্‌বার্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে, আট ফুট বালির স্তরের নীচে পাওয়া গিয়াছিল। উহা পিথেকেন্‌থ্রপাসের পরবর্ত্তী হইলেও ৫০০,০০০ পাঁচ লক্ষ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মানব বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। আধুনিক মানুষের চোয়ালের চাইতে উহা আকারে বড় ও মোটা। উহার আকার দেখিয়া উহা যে বানরের চোয়াল নহে তাহা বেশ বুঝা যায় এবং মানুষের চোয়াল বলিয়াই মনে হয়। আকারে বড় হইলেও

দাঁতগুলির গঠন সম্পূর্ণ মানুষের দাঁতেরই মত। আধুনিক মানবের সঙ্গে হিডেল্‌বার্গ মানবের সাদৃশ্য বেশী ছিল। কমই হউক আর বেশীই হউক,

হিডেলবার্গ শিকারী

নর-বানর উভয়ের চোয়ালেরই বিশেষত্ব যে উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মানবের দেহাবশেষের এই আবিষ্কার নৃ-তত্ত্বের আলোচনার দিক দিয়া, সকলেই খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই আবিষ্কারের জন্য সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর ব্যাপিয়া অনুসন্ধানের কাজ চলিয়াছিল। হিডেল্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ওটো সুটেনসেক (Dr. Otto Schoetensack) এই অনুসন্ধানকার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়াছিলেন। যে স্থানের স্তরে এই অনুসন্ধানকার্য্য চলিতেছিল তাহার মালীক, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে, তাঁহাদের সুদীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধানের কার্য্য যে ফলপ্রসূ হইয়াছে, এবং তাহার ফলস্বরূপ প্রাচীন মানবের পূর্ব্বোক্ত নীচের চোয়াল যে পাওয়া গিয়াছে, এই শুভ সংবাদ তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া উহা যে খুবই প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের মানবের দেহাবশেষ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অন্য প্রাচীন মানব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের বলিয়া তিনি উহার একটি পৃথক্ নাম দিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারে একদিকে যেমন একটি নূতন প্রাচীন মানবের খবর পাওয়া গেল, তেমনি আরও প্রাচীন মানবের দেহাবশেষ পৃথিবীর স্তরে, খুঁজিয়া বাহির করার জন্য অনুসন্ধানকার্য্যে মানুষের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। তাহারই ফলস্বরূপ পরবর্ত্তী পিল্টডাউন মানবের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইল। সত্য অনুসন্ধানের জন্য পণ্ডিতদিগের যে কি অসাধারণ অধ্যবসায়, এই হিডেল্‌বার্গ মানবের চোয়াল আবিষ্কার হইতে তোমরা তাহার কিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পার।

এই চোয়াল যে স্থানে যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, উহা নদীস্রোতে বালির সঙ্গে ক্রমশঃ গড়াইয়া যাওয়াতে আদত মাথার খুলি হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও উহার যে অংশটুকু এখনও আছে তাহা বেশ সুরক্ষিত অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। মানুষের নীচের চোয়ালের সম্মুখদিকে থুত্‌নির হাড় যে অপেক্ষাকৃত বাড়ান থাকে, তাহা তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। ল্যাজহীন বানর ও শিম্পাঞ্জি প্রভৃতির এই থুত্‌নি বাড়ান ত নয়ই বরং নীচের দিকে হেলান

ভাবেই থাকিতে দেখা যায়। হিডেল্‌বার্গ মানবের যে চোয়াল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার থুত্‌নি যে মানুষের মত সম্মুখদিকে বাড়ান ছিল না তাহা বেশ বুঝা যায়। এখন এই চোয়ালে যদি দাঁত সংলগ্ন না থাকিত তবে উহা যে মানুষের চোয়াল তাহা বলারই কোন উপায় ছিল না। উহার দাঁতের গঠন অনেকটা প্রাচীন মানবের দাঁতের মত হইলেও উহা যে মানুষের চোয়াল তাহা বেশ বুঝা যায়। এই চোয়ালের হাড় খুবই পুষ্ট এবং বড়; এমন কি বর্ত্তমানের এস্‌কিমো (Eskimo) জাতীয় মানুষ, যাহাদের নীচের চোয়াল বেশ সুপুষ্ট, তাহাদের চোয়াল হইতেও উহা বড় এবং পুষ্ট। উহার হাড়ের তুলনায় দাঁত অপেক্ষাকৃত ছোট। যুদ্ধ, আত্মরক্ষা ও অন্যান্য কারণে হয়ত উহারা দাঁতের তেমন ব্যবহার করিত না, তাহাতেই দাঁত আকারে তত বড় হয় নাই। ইহার পরবর্ত্তী সময়ের নিএন্‌ডারথেল্‌ মানবের দাঁতের সঙ্গে তুলনা করিলে উহারা যে উহাপেক্ষা ভিন্ন রকমের প্রাচীনতর একটি মানবের শাখা তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ইস্কিমো

হিডেলবার্গ মানব

শিম্পাঞ্জি
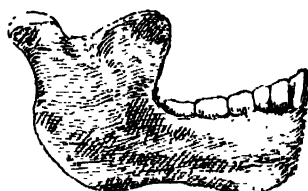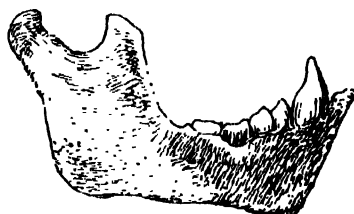
নীচের চোয়ালের এক পাশের তুলনামূলক চিত্র।

পিল্টডাউন মানব

(Piltdown Man)

ইংলণ্ডে সাসেক্‌সের অন্তর্গত—পিল্টডাউনের নিকটবর্ত্তী মাঠ হইতে তথাকার অধিবাসিগণ রাস্তা তৈয়ার করিবার জন্য শিলনুড়ি সংগ্রহ করিত। যে সকল লোক এই কার্য্যে ব্রতী ছিল তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি ভূতত্ত্ববিদ্ ডসন্ (Mr. Charles Dawson) সাহেবের নিকট একদিন মানুষের মাথার একটুক্‌রা হাড় পাঠাইয়া দিয়াছিল। উহা লৌহমিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণের পাথরের একটি টুক্‌রা বলিয়াই সে ব্যক্তির ধারণা হইয়াছিল। উহারই কিছুদিন পরে—১৯১১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ডসন্ সাহেব সেখানে শিলনুড়ির ভিতর আরও বড় আকারের মাথার সম্মুখদিকের আর একটি হাড়ের টুক্‌রা সংগ্রহ করেন। উহা যখন বৃটিশ মিউজিয়ামের সুপ্রসিদ্ধ লুপ্ত-জন্তু-বিদ্যা-বিশারদ উড্‌ওয়ার্ড (Dr. Smith Woodward) সাহেবকে দেখান হইল, তখন উহা যে একটি খুব দুর্লভ এবং আশ্চর্য্যজনক জিনিষ তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ফলে সকলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এই স্থানের অনুসন্ধানকার্য্য আরও চলিতে লাগিল।

এই অনুসন্ধানের ফলে প্রাচীন মানবের মাথার একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু মজুরদিগের কাজ করিবার সময় তাহা ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। উহার কতকগুলি অংশ ভাঙ্গা পাথরের টুক্‌রার ভিতর হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ডসন্ সাহেব নিজেই, যে স্থানে মাথার কঙ্কাল ছিল, সেই স্থানে নীচের চোয়ালের দক্ষিণাংশও পাথরের টুক্‌রার ভিতরে পাইয়াছিলেন। উড্‌ওয়ার্ড সাহেবও সেই স্থান হইতে একগজ পরিমাণ দূরে, একই স্তরের ভিতরে, মাথার পিছনদিকের

আর একখণ্ড হাড়ের টুক্‌রা পাইয়াছিলেন। এই মাথার খুলি ছাড়া সেখানে আরও অন্যান্য প্রাণীর শিলীভূত কঙ্কাল ও কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত জিনিষ (dressed flints) পাওয়া গিয়াছিল। তারপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একজন লুপ্ত-

প্রস্তরের অস্ত্র প্রস্তুতকার্য্যে নিযুক্ত পিল্টডাউন মানব

প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞ ফরাসী ছাত্র, ডসন্ সাহেবের সঙ্গে অনুসন্ধানকালে, একটি শ্বদন্ত পাইয়াছিলেন। স্মিথ উড্‌ওয়ার্ড সাহেব এই সকল হাড়ের টুক্‌রা

পরীক্ষা করিয়া এবং যথাস্থানে একত্র গ্রথিত করিয়া, যে মাথার খুলি প্রস্তুত করেন, তাহা প্রায় বানরের মাথার খুলিরই অনুরূপ। উড্‌ওয়ার্ড সাহেবের মতে উহা খুবই প্রাচীন এবং এই প্রাণী হইতে মানবের উৎপত্তির সূত্রপাত হইয়াছিল। উহাকে যে মানুষের মাথার খুলি বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, উহাতে মস্তিষ্কের আধার বানরের চাইতে বড়। চক্ষে ভ্রূর নীচের হাড় সাধারণ মানুষের মত মোটেই উচু ছিল না। নীচের দিকের চোয়াল মানুষের চেয়ে, বেশীর ভাগ বানরেরই মত ছিল। শ্বদন্ত আকারে মানুষের শ্বদন্তের চাইতেও বড় ছিল। মোটের উপর উহার নীচের দিকের চোয়াল শিম্পাঞ্জিরই মত।

দুর্ভাগ্যক্রমে পিল্টডাউন মানবের মাথার খুলি যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে অভ্রান্তরূপে কোন সত্য নির্দ্ধারণ একরূপ অসম্ভব। তাহা হইলেও উহা যে একটি অতি প্রাচীন মানবের চিহ্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এদের পরেও যারা ছিল
প্রাচীন বটে ঠিক্,
ওদের সাথে তুলনাতেই
হয়ত আধুনিক।

নিএনডারথেল্ মানব

(Neanderthal Man)

পূর্ব্বোক্ত মানবের শিলীভূত সম্পূর্ণ কঙ্কাল যে পাওয়া যায় নাই তাহা তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ, কিন্তু এই মানবের অপেক্ষাকৃত বহু কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোন কঙ্কাল সম্পূর্ণ আকারেই বর্ত্তমান আছে। সুতরাং উহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিবার সুবিধা আছে।

নিএনডারথেল্ মানবের মুখের আনুমানিক আকৃতি

স্পেইন, ফ্রান্স, পর্টুগাল, বেলজিয়াম ও জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে অর্থাৎ ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই উহাদের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শিলীভূত মানবের তুলনায় আধুনিক হইলেও, উহারা পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ

হাজার বৎসরের আগেকার মানব। উহাদের কঙ্কাল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, উহাদের আকার মানুষের মতই ছিল।

প্রুশিয়া দেশের অন্তর্গত নিএন্‌ডারথেল্‌ নামক উপত্যকাভূমি যাহার ভিতর দিয়া ডুসেল (Dussel) নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে ফেল্‌ডহোফার (Feldhofer) নামক একটি ক্ষুদ্র গুহা খননকালে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, শ্রমিকগণ একটি মাথার খুলি এবং হাত-পায়ের কতকগুলি লম্বা হাড় পাইয়াছিল। যদিও এই শ্রেণীর মানবের অস্থি-কঙ্কাল ইতিপূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে, তবুও এই প্রাচীন জাতীয় মানবের সম্বন্ধে ইহাই সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কার বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তাহা হইতেই উহার এই নাম হইয়াছে।

এই শ্রেণীর মানবের যত রকম মাথার খুলি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সকলেরই আকার একরূপ। উহাদের সকলেরই মাথার সম্মুখদিকের চাইতে পশ্চাৎদিকের অংশ সবিশেষ বর্দ্ধিত, ভ্রূর উপরের হাড়ের শিরা কপাল হইতে খুবই উচু, নাসিকার সংযোগস্থান ভিতরে ঢুকান এবং মুখমণ্ডল প্রশস্ত দেখা যায়। নিএন্‌ডারথেল্‌ মানবের নীচের দিকের চোয়াল মাথার খুলিরই মত বেশ সুপুষ্ট ও দৃঢ়। বিভিন্ন রকম মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশে কম বেশী যেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় তাহাদের পরস্পর দাঁতের পার্থক্য খুবই কম। নিএন্‌ডারথেল্‌ মানবের দাঁত যে মানুষের মত তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। চোয়ালের মত দাঁতও বেশ সুপুষ্ট, ঘন সন্নিবিষ্ট এবং সমান লম্বা। শ্বদন্ত অন্যান্য দাঁত হইতে কখনও উচু হইতে দেখা যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে বানরের সঙ্গে কোনরূপেই সাদৃশ্য নাই বরং বর্ত্তমান মানবের সঙ্গেই উহাদের দাঁতের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। মেরুদণ্ড বেশ মোটা, খাট এবং উহার অগ্রভাগের অস্থিখণ্ড শিম্পাঞ্জির মত। পাঁজরের হাড় খুবই সুপুষ্ট। পায়ের হাড়ও শিম্পাঞ্জিরই মত বাঁকা। নিএন্‌ডারথেল্‌ মানব লম্বায় খাট ছিল। উহাদের বাঁকা উরুর হাড় দেখিয়া মনে হয় যে, উহাদের হাঁটুও বাঁকা ছিল, হয়ত বা উহারা কুঁজোও ছিল। ঘনসন্নিবিষ্ট হাড়, সবল মাংসপেশী, প্রশস্ত বুক,

মস্ত বড় সবল হাত এবং প্রকাণ্ড মাথা গলার সম্মুখভাগে সংলগ্ন থাকাতে উহাদিগের আকার যে বেশ ষণ্ডাগুণ্ডার মত দেখাইত তাহা বেশ বুঝা যায়।

উহাদের মস্তিষ্কের অনেক বিষয়েই বানরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। মোটকথা এই নিএন্‌ডারথেল্‌ মানব যে এক নূতন শ্রেণীর মানব তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। উহারা পাথরের নানা রকম অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত; অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিত এবং মৃতদেহ কবর দিত। ইহাও একরূপ নিশ্চিত যে, যে রকমই হউক, উহাদের একটা ভাষা ছিল। সাক্ষাৎভাবে উহাদের সম্বন্ধে সকল খবর সংগ্রহ করা সম্ভবপর না হইলেও নানা রকম অনুসন্ধান দ্বারা উহাদের সম্বন্ধে এরূপ অনেক খবরই জানা গিয়াছে।

প্রাচীন মানবের ঊরুর হাড়ের তুলনামূলক চিত্র

নিএন্‌ডারথেল্‌ মানব যে সকল গুহাতে বাস করিত, তাহা খনন ও অনুসন্ধান করিয়া তাহার ভিতর বহু প্রাণীর অস্থি-কঙ্কাল ও তৎসঙ্গে পাথরের নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে তাহাদের সমসাময়িক প্রাণী, তাহাদের শিকার করিবার শক্তিসামর্থ্য এবং তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের খবর পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, উহারা বন্য বাইসন্‌, গরু, ঘোড়া, বল্গা হরিণ, এমন কি গণ্ডার, মেমথ প্রভৃতি বিশালকায় প্রাণী পর্য্যন্তও বধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা যে সকল গুহাতে বাস করিত, তাহাতে পূর্ব্বে যে গুহাবাসী ভল্লুক, হায়েনা ও বহু শিকারী পাখী থাকিত অনুসন্ধান
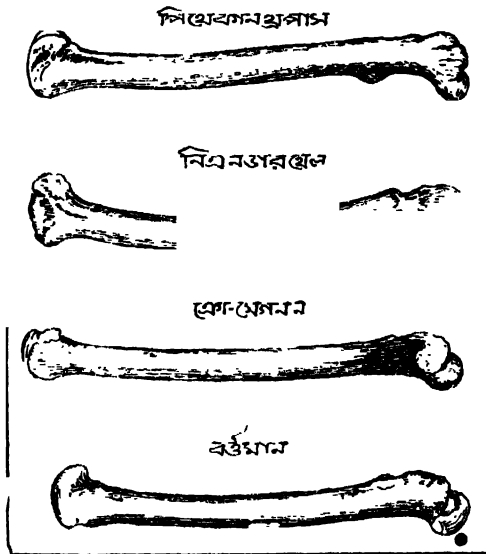
দ্বারা তাহাও বুঝা গিয়াছে। একটি গুহাতে আটশতের অধিক গুহাবাসী ভল্লুকের অস্থি-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখ উহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া সেই গুহা দখল করিতে—ওই সকল হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে তাহাদিগকে কি ভীষণ যুদ্ধই না করিতে হইয়াছিল! এসব ক্ষেত্রে জ্বলন্ত অগ্নির সাহায্যই হয়ত তাহারা বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। নিএন্‌ডারথেল্‌ মানবের শিকার-ব্যাপার যে কিরূপ ছিল তাহা ঠিক করা অবশ্য খুব সহজ নহে। গভীর
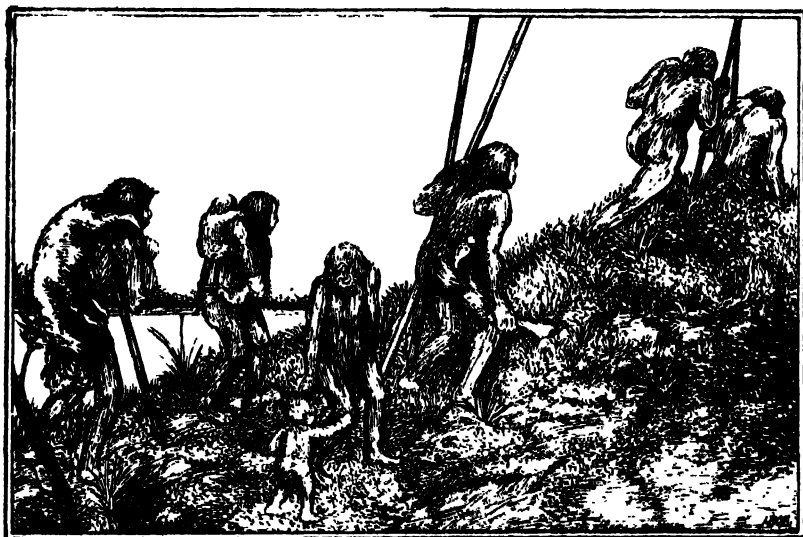
চলার পথে নিএন্‌ডারথেল্‌ মানবের দল

গর্ত্তে ফাঁদ পাতিয়া বড় বড় প্রাণী বধ করিবার উপায় হয়ত তাহাদের জানা ছিল। পাথরের তীর, বর্শা ও ঢিল ছুঁড়িয়া তাহারা শিকারের পশ্চাতে ধাবিত হইত।

খাদ্য এবং প্রাণীর কাঁচা চামড়া হইতে দেহাবরণ প্রস্তুতের কাজ স্ত্রীলোকেরাই করিত। শিকারের মাংস এবং হাড়ের ভিতরের কোমল পদার্থ উহারা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিত। বড় বড় প্রাণীর মোটা হাড় ভাঙ্গিয়া যে

তাহার ভিতর হইতে কোমল পদার্থ বাহির করিত পাথরে এখনও তাহার চিহ্ন আছে। এসকল কাজ তাহারা সাধারণতঃ দিনের বেলায় গুহার বাহিরেই করিত। বৃষ্টি-বাদ্‌লার দিনে কিংবা শীতকালে খুব ঠাণ্ডা বোধ হইলে, সকলেই গুহার ভিতরে আশ্রয় নিত এবং কাঠের মধ্যে আগুন ধরাইয়া সকলে মিলিয়া আরাম করিত। এরূপ দুর্দ্দিনে ব্যবহারের জন্য শুক্‌না কাঠ এবং মাংস পূর্ব্বেই তাহারা সঞ্চয় করিয়া রাখিত। তাহারা যে প্রদীপ জ্বালিত এখনও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহারা গুহার নিকট যাহাতে হিংস্র জন্তু না আসিতে পারে তাহার জন্য অগ্নি জ্বালিয়া রাখিত ; গুহামুখে পাথরের স্তূপ তৈয়ার করিয়া যাহাতে সহজে কোন জন্তু প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য পথ বন্ধ করিয়া রাখিত। এরূপে গুহাবাসের ব্যবস্থা থাকিলেও, তাহারা অধিকাংশ সময়েই শিকারের পিছন পিছন ঘুরিয়া বেড়াইত বলিয়া, উন্মুক্ত আকাশতলেই তাহাদিগকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত।

এই শ্রেণীর মানবের কোন সাক্ষাৎ-বংশধর এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। নৃ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ উহার যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সময়ের পরিবর্ত্তনে উহাদের শারিরীক শক্তির হ্রাস ও সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতার অভাব হওয়াতেই উহারা ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের চাইতে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী ক্রোমেগ্‌নন্ জাতির আক্রমণই তাহাদের ধ্বংসের প্রধান কারণ। এই নবাগত জাতির যুদ্ধের অস্ত্রও তাহাদের চাইতে উন্নততর ছিল। নিএন্‌ডারথেল্ মানব যুদ্ধের জন্য তীর-ধনুক ব্যবহার করিতে জানিত না, কিন্তু ক্রোমেগ্‌নন্ জাতির দূর হইতে তীর ছুঁড়িয়া যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ছিল ; সুতরাং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে তাহারা পরাস্ত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হইল। বর্ত্তমানে কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, উহাদের চিহ্ন একেবারেই যে লোপ হইয়া গিয়াছে তাহা নহে। অন্যান্য মানবের সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে এখনও তাহাদের চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহা খুবই বিরল।

রোডেসিয়ান্ মানব

(Rhodesian Man)

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত রোডেসিয়া হইতে এই শিলীভূত মানবের কঙ্কালের আবিষ্কার হইয়াছে। দক্ষিণ রোডেসিয়াতে ভগ্নপাহাড় (Broken Hill) নামে একটি পাহাড় আছে। সেখানে সীসা ও দস্তার খনি দেখিতে পাওয়া যায়। উহার ভিতর দিয়া একটি সুদীর্ঘ গুহা চলিয়া গিয়াছে।

রোডেসিয়ান্ মানবের (Rhodesian Man) মুখের আনুমানিক আকৃতি

সেই অঞ্চলে এই গুহা দীর্ঘকাল যাবতই উহার সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য কারণে সকলেরই পরিচিত। এই গহ্বরের ছাদ হইতে ঝাড়ের কলমের মত খুব লম্বা লম্বা চূণা পাথরের কলম ঝুলান থাকিয়া উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহা ছাড়া খনিজ পদার্থে পরিণত বহু প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অস্থি-কঙ্কাল উহাতে

দেখিতে পাওয়া যায়। খনিতে খননকার্য্যের দরুণ এই পাহাড়ের কতক অংশ এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্ম ঋতুর শেষদিকে, এই গুহার শেষ সীমাতে একটি মানুষের মাথার খুলি ও কতিপয় হাড় এবং কতকগুলি ভাঙ্গাচূরা অস্ত্রের সঙ্গে, অন্যান্য প্রাণীর হাড়ও মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সকল প্রাণী যে উহারই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এই অস্ত্রগুলি আফ্রিকার বর্ত্তমান বন্য মানুষের অস্ত্রেরই অনুরূপ।

রোডেসিয়ান্ মানবের মাথার সম্পূর্ণ খুলিই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু নীচের দিকের চোয়ালের হাড় পাওয়া যায় নাই। আফ্রিকার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের মধ্যে কাহারই মাথার আকারের সঙ্গে উহার সাদৃশ্য নাই, বরং নিএন্‌ডারথেল্ মানবের মাথার খুলির সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে। ভ্রূর উপরকার হাড়ের শিরা নিএন্‌ডারথেল্ মানবের চাইতেও উচু, কিন্তু কপালের হাড় তাহার আরও নীচু এবং হেলানভাবে গঠিত। দাঁতের আকার সম্পূর্ণ মানুষের দাঁতের মত ছিল, কিন্তু নাকের মস্তবড় ছিদ্রপথ অনেকাংশে গরিলার মত। বাস্তবিক পক্ষে উহার মুখমণ্ডল প্রায় গরিলার মুখের মতই বড় ছিল। মেরুদণ্ডের সঙ্গে মাথার সংযোগস্থান লক্ষ্য করিলে উহারা যে কতকটা সোজাভাবে দাঁড়াইয়া চলাফেরা করিত তাহা বেশ বুঝা যায়; উহাদের জঙ্ঘার সোজা অস্থিখণ্ড হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। ইলিয়ট স্মিথ (Elliot Smith) সাহেবের মতে উহাদের মগজ খুবই নিম্নস্তরের মানুষের মত ছিল। উহাদের সকল বিষয় এখনও জানা না গেলেও অন্ততঃ কয়েকটি কারণে এই আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানুষের মধ্যে উহাদেরই মুখের সঙ্গে বানরের মুখের সাদৃশ্য বেশী। শিলীভূত মানবের চিহ্ন আফ্রিকা মহাদেশেও যে আছে উহারাই তাহার নিদর্শন। আর যে দুইটি লাঙ্গুলহীন জীবন্ত বানর,—শিম্পাঞ্জি ও গরিলার সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য বেশী, তাহারাও এই আফ্রিকা মহাদেশেরই অধিবাসী।

মোটকথা যদিও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যই দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি উহাদের সম্বন্ধে সকল বিষয় আলোচনা করিলে বর্ত্তমানে

এইটুকু বলা চলে যে, নিএন্‌ডারথেল্‌ মানব, রোডেসিয়ান্‌ মানব এবং অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান অধিবাসিগণ একই পূর্ব্বপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন বংশধর। এই মাথার খুলির বাহ্যিক এবং রোগজনিত অবস্থান্তর দেখিয়া মনে হয় যে, উহা খুবই প্রাচীন নয়। হয়ত এই জাতির বংশধর আফ্রিকার জঙ্গলের কোন অজ্ঞাত প্রদেশে এখনও বাস করিতেছে।

ক্রোমেগ্‌নন্‌ মানব

(Cro-magnon Man)

ফ্রান্সদেশের মধ্যে ভিজেয়ার (Vezere) উপত্যকায় ক্রোমেগ্‌নন্‌ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। উহার সন্নিহিত স্থানে রেলরাস্তা নির্ম্মাণের জন্য নিযুক্ত শ্রমজীবিগণ যখন কাজ করিতেছিল, তখন একটি গুহা ঘটনাক্রমে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই গুহার উপরদিক পাথরের স্তূপে আবৃত ছিল। উচ্চ রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য ক্রমে ক্রমে যখন সেই স্থানের পাথর স্থানান্তরিত করা হইল, তখন এই গুহা দেখা গেল। উহা কতকগুলি প্রাণীর ভাঙ্গাচূরা হাড়, মানুষের মাথার খুলি ও চক্‌মকি পাথর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। যে দুইজন কনট্রাক্‌টার কাজ করাইতেছিলেন তাঁহারা উহার মূল্য বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং যথাস্থানে অবিলম্বে খবর দিয়াছিলেন। উহাতে পাঁচটি মানুষের কঙ্কাল ছিল; তাহাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ, দুইটি যুবক, একটি স্ত্রীলোক ও একটি অপ্রসূত শিশু ছিল। এই জাতীয় মানবের চিহ্ন ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য স্থানেও ইতিপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে এই আবিষ্কার বিশেষ প্রসিদ্ধ বলিয়া, এই স্থানের নাম অনুযায়ী উহার নাম ক্রোমেগ্‌নন্‌ রাখা হইয়াছে।

এই মানবগণ যে মেমথের সমসাময়িক তাহা তাহাদের কঙ্কালের সঙ্গে যে অন্যান্য প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায়। উহাদের মাথার খুলি লম্বা এবং অপ্রশস্ত। মাথার গঠন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কোন সামঞ্জস্য নাই; অর্থাৎ উহাদের মাথার খুলি লম্বা হইলেও মুখমণ্ডল উহার তুলনায় বেশ বিস্তৃত। ভ্রূর নীচের হাড় বেশ উচু; উহাদের থুত্নিও বেশ পুষ্ট এবং সম্মুখদিকে বাড়ান। নাকের হাড়ও সম্মুখদিকে বাড়ান, বেশ লম্বা এবং অপেক্ষাকৃত সরু। দুই চক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থান অপেক্ষাকৃত কম এবং উপরের

ক্রোমেগ্নন্ মানবের (Cro-magnon Man) মুখের আনুমানিক আকৃতি

চোয়াল বেশ সুপুষ্ট। উহারা আকারে বেশ লম্বা, চওড়া ও সবল ছিল। পায়ের মোটা হাড় উহাদের সকলেরই প্রায় চেপ্টা রকমের। বিশেষভাবে এই লক্ষণের জন্যই উহারা নিএন্ডারথেল্ মানব হইতে পৃথক্; কেননা নিএন্ডারথেল্ মানবের পায়ের হাড় কখনই এরূপ চেপ্টা হইতে দেখা যায় নাই। হাতের তুলনায় পা উহাদের লম্বা ছিল।

তাহারা যে স্থানে বাস করিত তাহা দক্ষিণের ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে আশ্চর্য্য

রকমে সুরক্ষিত ছিল। প্রচুর শিকার করিবার সুযোগ এবং তথায় বাসের জন্য যথেষ্ট আশ্রয় স্থান থাকাতে উহাদের এই লম্বা, চওড়া, সবল ও সুপুষ্ট দেহ গঠনের যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। খাদ্য যে তাহারা প্রচুর সংগ্রহ করিতে পারিত তাহা গুহা ভিতরে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রাণীর অস্থি-কঙ্কালের পরিমাণ দেখিয়াই অনুমান করা যায়। ক্রোমেগ্নন্ জাতি তাহাদের মৃতদেহ কবর দিত এবং মৃত্যুর পরেও যে মানুষের অস্তিত্ব লোপ হয় না একথা তাহারা বোধ হয়

গ্রিমল্ডি (Grimaldi-Man) মানবের মুখের আনুমানিক আকৃতি

বিশ্বাস করিত। কেননা তাহদের মৃতদেহের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন মানবের মধ্যে ক্রোমেগ্নন্ মানব যে শুধু আকারে মানব তাহা নহে, তাহারা আধুনিক ইউরোপ-বাসীদিগের পূর্ব্বপুরুষ। উহারা খৃষ্টের জন্মের ১০,০০০ দশ হাজার হইতে ২৫,০০০ পচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল। উহারা লম্বায় এবং মস্তিষ্কের পরিমাণে বর্ত্তমানের যে কোন মানব হইতে

শ্রেষ্ঠ। এই জাতি যে শুধু লম্বাই ছিল তাহা নহে, উহারা দেখিতেও এবং কাজকর্ম্মেও বেশ চট্পটে ছিল। উহারা সুগঠিত বর্শা ব্যবহার করিত এবং শ্রমশিল্পেও বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। এইরূপ গ্রিমল্ডি (Grimaldi Race), ব্রুণ (Brunn Race), নিওলিথিক (Neolithic Race) ও চেন্‌সিলেড

চেন্‌সিলেড (Chancelade Man) মানবের মুখের আনুমানিক আকৃতি

(Chancelade) প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রাচীন মানবের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহারা সকলেই পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন মানবের তুলনায় যে আধুনিক সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, এই গ্রিমল্ডি মানবই বর্ত্তমান নিগ্রো জাতির পূর্ব্বপুরুষ। তাহাদের মুখের সঙ্গে উহাদের মুখের বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রাচীন ও আধুনিক মানবের উৎপত্তি
ও পরস্পরসম্বন্ধের পরিকল্পনা
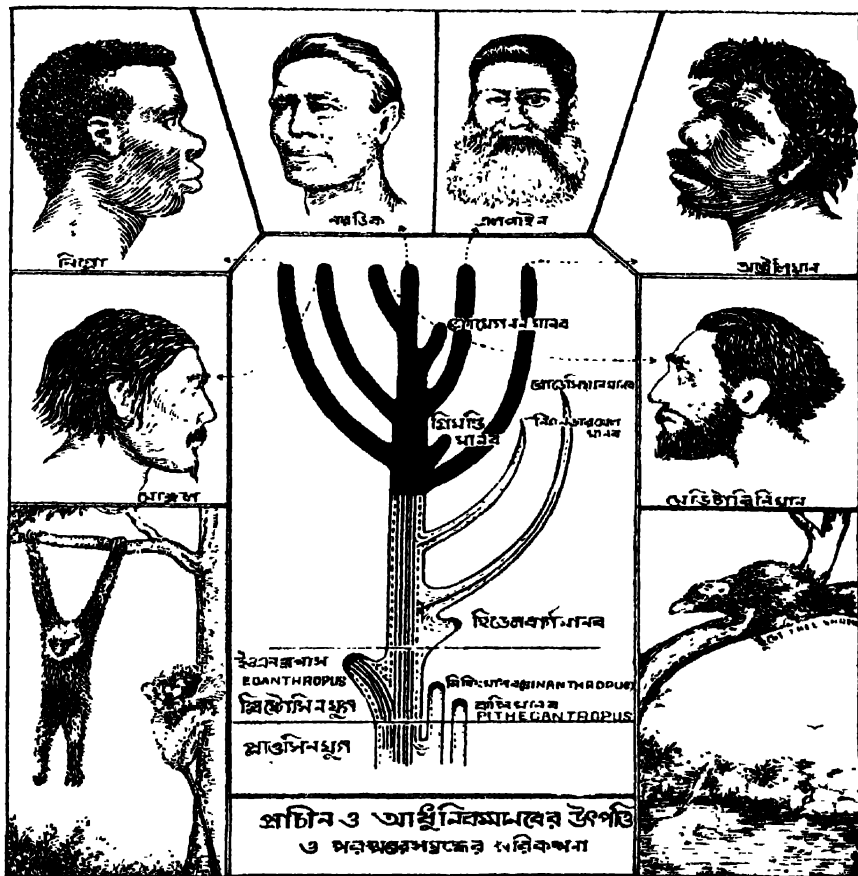
মোদের সাথে আদি মানব—
তুলনাতে দৈত্য দানব।

বর্ত্তমান সভ্য মানবের চেহারা, আচার-ব্যবহার, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতির সঙ্গে এই সকল প্রাচীন মানবের সকল বিষয়ের তুলনা করিলে, বর্ত্তমান সভ্য মানব যে তাহাদেরই বংশধর একথা যেন বিশ্বাসই হয় না। রোমাবৃত সেই প্রাচীন আদি মানবের সঙ্গে, আজকালকার পোষাকপরিচ্ছদে শোভিত একজন সভ্য মানবের নানা বিষয়ে পার্থক্য যে কত বড় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমরা উহা বেশ বুঝিতে পারিবে। এই পরিবর্ত্তন শতেক দুইশত বৎসরে সম্ভব হয় নাই। সহস্র সহস্র বৎসরে ক্রম-পরিবর্ত্তনের ফলে আজ মানবের এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন মানবের সেই আচার-ব্যবহার, হাবভাব অসভ্য বর্ব্বর বনচর মানুষের ভিতর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

যে পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইল তাহা মানব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। তোমাদের জীবনেও এই পরিবর্ত্তনের বহু উদাহরণ দেখিতে পাইবে। মানুষ যে বহু নূতন নূতন জিনিষ এবং নূতন নূতন আদর্শের ক্রমাগতই সৃষ্টি করিতেছে, তাহা তোমরা এখনও অহরহ দেখিতে পাইতেছ। পোষাকপরিচ্ছদ, খাদ্যাখাদ্য আজ যাহা তোমরা ভাল মনে করিতেছ, দশ বৎসর পরে তাহাই হয়ত তোমাদের নিকট নিতান্ত পুরাতন এবং সেকালের বলিয়া মনে হইবে। বনচর অসভ্য মানবের ভিতর এই পরিবর্ত্তনের ফল বিশেষ-ভাবে প্রকাশ না হওয়ার কারণ তাহারা সভ্য এবং উন্নত মানবের সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত। নিজেরা জীবনযাত্রার যতটুকু উন্নত প্রণালী বাহির করিতে পারিয়াছে তাহার বেশী বাহির হইতে কিছুই তাহারা পায় নাই, তাই আজও তাহারা অসভ্য এবং বর্ব্বর। যে সকল অসভ্য জাতি সভ্য মানবের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে তাহারা যে ক্রমশঃ উন্নততর জীবনযাপন করিতেছে, বহু স্থানে এখন তাহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষের নূতন জিনিষ এবং আদর্শ সৃষ্টির মূলে যে সকল কারণ রহিয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে দুইটি কারণই তাহার মধ্যে প্রধান বলিয়া মনে হয়। তাহার মধ্যে মানুষের জীবন-সংগ্রাম অর্থাৎ আত্মরক্ষার চেষ্টা একটি এবং অপরটি তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রবৃত্তি এবং তাহার উপভোগের লালসা। এই সকল বিষয় মানুষের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া, মানুষকে নানাদিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। চিন্তা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ের বহু উদাহরণ তোমরা তোমাদের চারিদিকেই দেখিতে পাইবে। মানুষের উদ্ভাবিত কল-কারখানা, যান-বাহন প্রভৃতি সকলই উহাদের উদাহরণ। এই দুইটি, অতীতের মানবের ভিতরে কিরূপভাবে প্রকাশ পাইয়া, মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছিল, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

এই দুইটির মধ্যেও আবার আত্মরক্ষার চেষ্টাই প্রধানতর। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সকল মানুষের মনেই সর্ব্বদা জাগ্রত আছে। মানুষ কেন কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ, এমন কি নিতান্ত নিম্নস্তরের প্রাণী মাত্রকেই আত্মরক্ষায় সচেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একটি সামান্য পিপীলিকা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য দৌড়াইয়া পালায়, ইহা তোমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছ। মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্য চাই, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্র চাই, অস্বাভাবিক শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গাত্রাবরণ ও সুরক্ষিত বাসস্থান চাই। এই প্রয়োজনবোধ মানুষের মনে যত বাড়িতেছিল, ততই তাহারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেননা এই প্রয়োজন দূর করিবার জন্য তাহারা নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল এবং তাহা হইতেই তাহাদের ক্রমোন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল।

অতীতের কথা

আদি মানব দীন হীন—
নগ্নদেহ বনচর ;
তাদের মোরা বংশধর—
বুদ্ধিবলে সভ্য নর।

পৃথিবীতে প্রথমতঃ যখন মানবজাতির আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন তাহারাও তাহাদের জ্ঞাতি বানরের মতই নগ্নদেহে দীনহীনভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিত। কাজ-কর্ম্ম কিংবা যুদ্ধ করিবার জন্য তখন তাহাদের কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। তাহাদের চাইতে আকারে বড় এবং শক্তিশালী বহু প্রাণী ছিল, সুতরাং বিপদের সময়, আত্মরক্ষার জন্য নিকটে পাহাড়-পর্ব্বতের গুহা থাকিলে তাহাতে আশ্রয় নিতে হইত। আর সে সুবিধা না থাকিলে তাহারা গাছের উপর চড়িয়াই আত্মরক্ষা করিত। একস্থান হইতে স্থানান্তরে চলাফেরার জন্য পা-ই তখন তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। নদী, খাল অগভীর হইলে পারাপারের সময় হাঁটিয়াই পার হইত ; আব সেগুলি গভীর হইলে সাঁতরাইয়া পার হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। খাদ্য সম্বন্ধে উদ্ভিদই প্রধান সম্বল ছিল। সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ কোন মৃত প্রাণীর দেহ পাইলে হয়ত তাহারা তাহার মাংস খাইত। তৎকালীন অনেক বন্য প্রাণীর চাইতেই তাহাদের আকার, শক্তি, গতি অনেকাংশেই ন্যূন ছিল। শুধু তাহাই নহে, এমন কি আত্মরক্ষা কিংবা যুদ্ধের জন্য দেহে তেমন কোন স্বাভাবিক অস্ত্রও ছিল না যাহাদ্বারা তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে। তবুও জীবন-সংগ্রামে মানুষ এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে এবং সকল প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে। যদি বল যে উহার কারণ কি ? তাহা হইলে সেই নগ্ন আদি-মানবের দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্বগুলির প্রতি তোমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। যে মানবদেহ আপাততঃ দেখিতে এত দুর্ব্বল বোধ হয়, তাহাতে যে বিশেষত্ব আছে তাহা তোমাদিগকে বাহির করিতে হইবে।

তোমরা তোমাদের যে দুইটি হাত দেখিতেছ তাহা হাতী, ঘোড়া, গণ্ডার প্রভৃতি প্রাণীর সম্মুখদিকের পা দুইটির তুলনায় খুবই দুর্ব্বল, তাহা হইলেও উহাদের ক্ষমতা অসাধারণ। তাহাদের সাহায্যে মানুষ না করিতে পারে এমন কোন কাজ নাই। এই হাত মানুষ তাহার সৃষ্টির আদি হইতেই লাভ করিয়াছে।
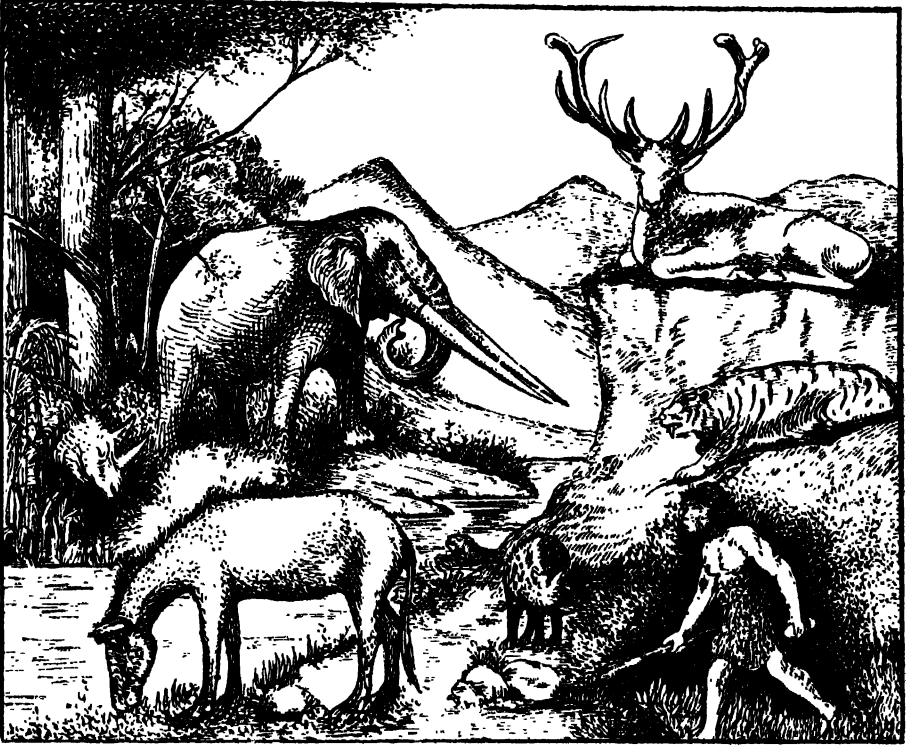
বন্য জন্তু পরিবেষ্টিত প্রাচীন মানব

তাহা ছাড়া মানুষের ভাষা আছে। এই ভাষা প্রথমতঃ নিতান্ত সাধারণ রকমের হইলেও, তাহারা যেরূপেই হউক পরস্পর মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত। ইহা মানুষের একটা মস্তবড় বিশেষত্ব। সকলের উপর মানুষের প্রধান বিশেষত্ব

তাহার মাথার খুলি ও তাহার মস্তিষ্ক। সকল প্রাণীর চাইতেই উহা ওজন এবং পরিমাণে বেশী ; তোমাদিগের নিকট একথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধির আধার এই মস্তিষ্কের সাহায্যে, কোন কিছু দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা হয়, অতি সহজেই মানুষ তাহা মনে রাখিতে পারে। এই অভিজ্ঞতা যে কি তাহা হয়ত তোমরা সকলে বুঝিতে পার নাই। এরূপ বহু অভিজ্ঞতা তোমরা প্রায় প্রত্যহই লাভ করিতেছ, সুতরাং একটু বুঝাইয়া দিলেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

আমাদের গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কুকুর, অপরিচিত মানুষ কিংবা অন্য কিছু দেখিলে অনবরত চীৎকার করিতে থাকে, তাহা তোমরা হয়ত সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ। তাহা হইতে রাত্রিবেলা কুকুর ডাকিলে, বাড়ীতে অপরিচিত লোক অর্থাৎ চোর আসিয়াছে বলিয়া তোমরা সন্দেহ কর। বাড়ীর সকল লোকই তখন সতর্ক হন। ইহাতে অনেক সময় চোরের হাত হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষা হইতেও দেখা যায়। তোমাদের এই যে অভিজ্ঞতা লাভ হইল, তাহা হইতে তোমরা কুকুরকে একটা উপকারী জন্তু বলিয়া মনে কর। অনেকেই আবার এজন্য যত্ন করিয়া কুকুর পুষিয়া থাকেন। অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ জ্ঞানলাভের বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। তোমরা একটু চিন্তা করিলে, নিজেদের জীবনেও অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞানলাভের এরূপ উদাহরণ বহু দেখিতে পাইবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এরূপ অনেক অভিজ্ঞতালাভ করে। বৃদ্ধলোকের কাছে পরামর্শ করিয়া কাজ করিবার যে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, বৃদ্ধলোকের বয়স বেশী, সুতরাং তিনি সংসারে অনেক কিছু দেখিয়াছেন। সেজন্য নানা বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান, তোমাদের চাইতে বেশী থাকাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই অভিজ্ঞতার চাইতেও, মানুষের মনে কোন কিছু জানিবার যে কৌতূহল-প্রবৃত্তি এবং কারণ-নির্দ্দেশের আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাই তাহার অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মস্তবড় কারণ। মানুষছাড়া আর কোন প্রাণীতেই উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষের সেই নগ্ন অসহায় অবস্থাতেও

তাহার এই সকল বিশেষত্বগুলিই তাহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়াছে।

এখন সেই আদিম অসভ্য অবস্থা হইতে, মানুষ কি করিয়া নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান সভ্য অবস্থায় উপনীত হইল তাহা জানিতে হইলে, অনেক কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার। তাহা তোমাদের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। বিভিন্ন পণ্ডিত গভীর গবেষণাদ্বারা এ সম্বন্ধে যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, মোটামুটি ভাবে তাহারই কথা এখানে কিঞ্চিৎ আলোচন করা হইল। এর পর বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে তোমরা আরও বহু কথা জানিতে পারিবে।

বিপদ-বাধা সাথের সাথী
যেথায় থাকে মানব জাতি।

মানুষ যখন যেস্থানেই থাকুক না কেন, বাধাবিঘ্ন, বিপদ-আপদে পরিবেষ্টিত হইয়াই ছিল। তাহাদের মধ্যে যে সকল বিপদ-আপদ তাহারা চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা দূর করিতে পারিত, তাহা তাহারা যেরূপেই হউক দূর করিয়া ফেলিত। আর যাহা দূর করা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে ছিল, তাহা তাহারা কোন অজ্ঞাত অসম্ভব শক্তির কার্য্য বলিয়া মনে করিত। এস্থলে উদাহরণ-স্বরূপ বজ্রপাতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহার সম্বন্ধে কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ভয়ে ভয়ে তাহারা আকাশের দিকে মাথা নত করিত। এই ভয় হইতেই প্রথমতঃ মানুষের উপাসনার আরম্ভ হইয়াছিল। উপাসনার বিষয় এখানে আলোচনা না করিয়া, তাহারা কিরূপভাবে নিজেদের চেষ্টায় উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইল তাহারই কথা কিঞ্চিৎ বলা হইল।

মানুষের বাসস্থানের অবস্থান অনুসারে সকল স্থানে বসবাসের সুবিধা-অসুবিধা একরূপ ছিল না। স্থানীয় আবহাওয়া, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের প্রকৃতি প্রভৃতি অনেক কিছুর উপরেই বসবাসের সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করিত। কোন স্থানে হয়ত প্রবল শীত। কোন স্থান হয়ত উষ্ণপ্রধান কিন্তু হিংস্র জন্তুতে

পরিপূর্ণ। বাসের পক্ষে কত জায়গাতে যে এরূপ কত রকমের অসুবিধা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মানুষ প্রথমেই যে স্থানীয় এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাকে নিজেদের বাসের অনুকূল অবস্থাতে আনিতে পারিয়াছিল তাহা মনে হয় না। ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া তাহারা তাহাদের অসুবিধাগুলির প্রতীকারের
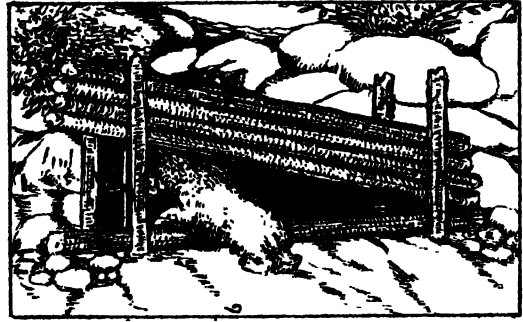
প্রাচীন মানবের পশু শিকারের জন্য বিভিন্ন রকম ফাঁদ

উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাহা হইতেই অস্ত্র-শস্ত্র, ঘরবাড়ী, হিংস্রপ্রাণী বধের জন্য নানারকম ফাঁদ, জাল ইত্যাদি যাহা কিছু ক্রমে ক্রমে সকলই তাহারা নিজেদের বুদ্ধিবলে প্রস্তুত করিয়াছিল। আর তাহা হইতেই তাহারা শিকার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মাছ ধরিবার কায়দা ইত্যাদিও শিক্ষা করিয়াছিল।

খাবার খুঁজে যুদ্ধ ক'রে,
ক্রমোন্নতি হইল পরে।

মানুষের খাদ্য আমিষ ও নিরামিষ, এখনও যেমন দুই রকমের, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। খাদ্য সংগ্রহ এবং তৈয়ারের ব্যবস্থা হয়ত ভিন্ন রকমের হইতে পারে, কিন্তু মানুষের খাদ্য সব সময়েই এই দুই রকমেরই। প্রথমতঃ স্বভাবজাত ফলমূল, তরিতরকারী ইত্যাদি খাদ্য অতীতের মানবের পক্ষে সহজলভ্য হইলেও, আমিষ খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদের মনে শিকারের প্রবৃত্তি জন্মিল এবং সেজন্য অস্ত্র-শস্ত্রেরও আবশ্যক হইল। শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্যও যে অস্ত্রের দরকার ছিল পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ উহারা আত্মরক্ষার জন্য দাঁত-নখ ইত্যাদির ব্যবহার করিত। সে সময় উহাদের দাঁত বিশেষভাবে শ্বদন্ত, যে খুবই পুষ্ট, সবল এবং আকারে বড় বড় ছিল, তাহা সেই সকল অতীতের মানবের চোয়াল ইত্যাদি হইতেই বেশ বুঝা যায়।

প্রথমতঃ শিকার ও শত্রু তাড়াইবার জন্য, তাহারা পাথরের টুক্‌রা সাধারণ-ভাবে ঢিলের মত ছুড়িবার কায়দা বাহির করিল। তারপর দূর হইতে পাথরের ঢিল সবেগে নিক্ষেপেরও ক্রমশঃ নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। ঢিল ছুড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত তাহারা গাছের মোটা ডালপালা ইত্যাদি লাঠিরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে প্রাণিদেহের কোন কোন অস্থিখণ্ড তাহাদের অস্ত্রের স্থান অধিকার করিল। মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, পাথরের অস্ত্রও যে তাহারা ক্রমশঃই উন্নততর আকারে গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর স্তরের ভিতরে প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়ের নানা রকম অস্ত্রের আকার হইতেই বেশ বুঝা যায়। দূর হইতে শিকার কিংবা শত্রুকে আক্রমণ করিবার বিশেষ সুবিধার জন্য কালক্রমে তাহারা তীর-ধনুক তৈয়ার করিয়াছিল। এইভাবে আরও নানা রকমের অস্ত্রের উদ্ভব হইল। এই ক্রমোন্নতিতেই আজ পর্য্যন্ত কত ভয়ানক শক্তিশালী কামান-বন্দুক ইত্যাদির

যে সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার শেষ নাই। যুদ্ধ করিবার জন্য দাঁত-

প্রাচীন মানবের হরিণ শিকার
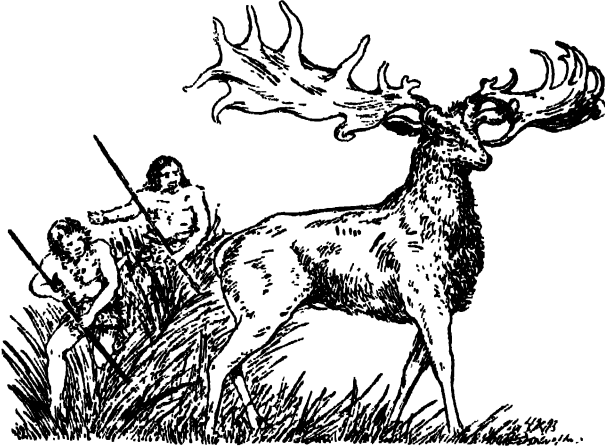
নখের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের আকারও ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। শ্বদন্তও অন্যান্য দাঁতের ন্যায় ছোট হইয়া গিয়াছে।

আগুনের গুণ বুঝল তা'রা
করল তৈয়ার খাবার বাসন,
সেই অতীতেই মানব জাতি
গড়তে জানত সুশ্রীগঠন।

অগ্নির সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করিবার দিকে প্রথমেই মানুষের দৃষ্টি পড়ে নাই। খাদ্য আমিষই হউক আর নিরামিষই হউক, তখন তাহারা কাঁচাই ভক্ষণ করিত। আগুনের সাহায্যে যে শীত নিবারিত হয় এবং আগুন দেখিলেই যে হিংস্র প্রাণী দূরে পালাইয়া যায়, সে বিষয় তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু আগুনের সাহায্যে যে সুখাদ্য খাবার তৈয়ার হইতে পারে, তাহা তাহারা প্রথমতঃ বুঝিতে পারে নাই। শীত নিবারণ ও হিংস্র জন্তু তাড়াইবার উদ্দেশ্যেই মানুষ প্রথমতঃ আগুনের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের

জন্য নানা বিষয়েই যে অগ্নির বিশেষ প্রয়োজন আছে, মানুষ তাহা ক্রমশঃ আরও বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল। এই সকল কারণে ও অগ্নির দাহিকাশক্তির জন্যই বোধ হয় আর্য্যদিগের মধ্যে অগ্নির উপাসনার সূত্রপাত হইয়াছিল। শক্তির নিকট সকলেই মাথা নত করিয়া থাকে। কি উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করা যায়, তাহা জানিবার পূর্ব্বেই মানুষ নানা রকম কাজে অগ্নির সাহায্য নিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালক্রমে তাহারা অগ্নি উৎপাদনের পন্থাও বাহির করিয়া নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ যথেষ্ট সুগম করিয়াছিল।

কাঠে কাঠে ঘর্ষণে দৈবাৎ বনের ভিতর আগুন জ্বলিয়া যে দাবানল দেখা দিত, তাহাতে বহুপ্রাণী দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তাহারা সেই মৃত প্রাণীর মাংস খাইয়া, কাঁচা মাংস হইতে তাহা যে অপেক্ষাকৃত সুখাদ্য তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। আর গুহার কাছে আগুন জ্বালাইয়া রাখিলে গুহাবাসী ভল্লুক, অসিদন্ত ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রপ্রাণী গুহার কাছে আসিবে না এবং তাহাতে

প্রাচীন মানবের অগ্নি উৎপাদন

মাংস পুড়াইয়া খাওয়ারও সুবিধা হইবে এজন্য দৈব কারণে উৎপন্ন দাবানল হইতে কাঠ জ্বালাইয়া, তাহারা অগ্নি সঞ্চয় করিয়া রাখিত। আত্মরক্ষা এবং খাদ্য প্রস্তুতের জন্য অগ্নির যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা তাহারা ক্রমে বেশ বুঝিতে

পারিল। তারপর কঠিন চকমকি পাথর হইতে অস্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে তাহারা প্রায়ই দেখিতে পাইত। তাহা হইতে মানুষ চকমকি পাথর দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে আগুন জ্বালাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে মানুষ তামা, কাঁসা, পিতল প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত বহু তৈজস-পত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। আদি মানব ইহাদের নির্ম্মাণপ্রণালী কিংবা ব্যবহার জানিত না। যখন তাহারা প্রথমতঃ পাত্র ব্যবহারের আবশ্যক বোধ করিয়াছিল, তখন তাহারা প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ হইতেই তাহাদের আবশ্যক পাত্র সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দিয়াছিল। সে সময় তাহারা শুষ্ক লাউএর খোল, নারিকেলের মালা প্রভৃতি পাত্ররূপে ব্যবহার করিত। তারপর তাহারা পাথর, মাটি, কাঠ প্রভৃতি দ্বারা পাত্র প্রস্তুতেরও উপায় উদ্ভাবন করিল। এইরূপে মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের ব্যবহৃত তৈজসপত্রও ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর হইতেছিল। তাহাদের নির্ম্মিত প্রাচীন পাত্র অথবা ভাণ্ড যাহা ভূগর্ভ হইতে এপর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দেখিলে সেই প্রাচীন মানবের সৌন্দর্য্যজ্ঞানেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল পাত্রের উপর যে নানা রকম ছবি অঙ্কিত ছিল এখনও তাহা বুঝা যায়। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন মানবগণ নানা জিনিষের দ্বারা যে ক্রমশঃ বিভিন্ন আকারের উন্নততর পাত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার বহু চিহ্ন ভূগর্ভ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আদিম কালের বন্য মানব
জীবন যাপন কুঁড়েঘরে ;
আজ তাহারই উন্নতিতে
হর্ম্ম্যরাজি বিরাজ করে।

ল্যাজহীন বানর গাছের উপর বাসের উপযোগী আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করে। বিবর বড় বড় গাছ কাটিয়া জলের ভিতর বাসা বাঁধে, ইহা তোমরা হয়ত সকলেই

জান। কিছু সময়ের জন্য হইলেও, এমন কি পাখী পর্য্যন্তও বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বাসানির্ম্মাণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেয়। তোমাদের পরিচিত বাবুই পাখীর বাসার কথা একবার ভাবিয়া দেখ। তাহারা কেমন সুন্দর ও নিপুণভাবে বাসা বুনিয়া তাহাতে বাস করে। নিতান্ত নিম্নস্তরের প্রাণী, যেমন মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, পিপীলিকা প্রভৃতিও বাসানির্ম্মাণে কি কম কৃতিত্বের পরিচর দেয়? আর মানুষ সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব, সে যে কোন সময় নিজের ব্যবহারের জন্য বাসস্থান প্রস্তুত করিতে পারিত না, তাহা কখনও বিশ্বাস করা যায় না। হয়ত তাহাদের প্রস্তুত আদি বাসস্থান তেমন সুবিধাজনক নাও হইতে পারে, কিন্তু বাসস্থান নির্ম্মাণের ক্ষমতা যে তাহাদের প্রথম হইতেই ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই

প্রথমতঃ প্রকৃতিদত্ত বাসস্থান, যেমন পর্ব্বতের গুহা প্রভৃতিতে তাহারা বাস করিতে পারিত। সেজন্য তখন হয়ত তাহারা কোনরকম বাসস্থান নির্ম্মাণের দিকে মনোযোগ দেয় নাই ; প্রকৃতিদত্ত বাসস্থানে যখন আর তাহাদের কুলাইয়া উঠিল না, তখন হইতে তাহারা বাসগৃহ প্রস্তুতের দিকে মন দিয়াছিল। সেই প্রাচীন মানবের প্রথম উদ্ভাবিত বাসগৃহ কখনও তেমন উন্নত আকারে প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তারপর ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর আকারে গঠিত হইতে লাগিল। গৃহ-নির্ম্মাণে সেই উন্নতির ধারা এখনও চলিতেছে। ফলে পৃথিবীতে সুন্দর সুন্দর গৃহের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। আরও যে কত উন্নতি হইবে এখনও তাহা বলা যায় না। অসভ্য মানবের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে সেই প্রাচীন মানবের কুঁড়ে ঘরের ন্যায় কুঁড়েঘর দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদেরই ক্রমোন্নতিতে বর্ত্তমানে ইট-পাথরের বড় বড় ঘর প্রস্তুত সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রাচীন মানবগণ, বনজঙ্গলে সহজলভ্য গাছপালার সাহায্যে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে, প্রথমতঃ নানা রকম বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল। বর্ত্তমানে গৃহ বা ঘর বলিতে তোমরা যাহা বুঝ, প্রাচীন মানবের নির্ম্মিত আদি বাসগৃহে

তাহার কিছুই ছিল না। কতকগুলি কাঠের টুক্‌রা পুঁতিয়া শীতল বায়ুস্রোতের বিরুদ্ধে কাঠের দেওয়াল প্রস্তুত করিত, হয়ত বা তাহার আশ্রয়েই বাস করিত।

প্রাচীন মানবের বিভিন্ন রকম বাসগৃহ

কোথাও বা গাছের ডালের উপর ঘাসের আবরণ দিয়া তাহার তলাতেই কোনমতে বাস করিত। প্রাচীন মানবের এইরূপ নানা মত বাসস্থানের ছবি

যাহা এখানে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই তোমরা তাহাদের বিভিন্ন রকম বাসগৃহের একটা ধারণা করিতে পারিবে।

তারপর গৃহনির্ম্মাণের জন্য যখন কাঠের অভাব বোধ হইল, তখনই মানুষের মন ইট-পাথরের দ্বারা গৃহনির্ম্মাণের দিকে আকৃষ্ট হইল। কাঠের ঘরের ক্রমোন্নতিতেই যে ইট-পাথরের ঘর প্রস্তুত সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা এখনও বেশ বুঝা যায়। আমাদের দেশে ধর্ম্মমন্দিরের ছাদ ইত্যাদির কাজ যে অনেকটা কাঠের ঘরেরই অনুকরণে প্রস্তুত তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন মানবের বাসস্থান অনুসন্ধানের ফলে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, প্রাচীন মানব ঘর-বাড়ী, অস্ত্র-শস্ত্র, তৈজসপত্র প্রভৃতি যাহা কিছু উদ্ভাবন করিয়াছিল, সকলই তাহারা তাহাদের স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারেই করিয়াছিল। যে স্থানে যে জিনিষের প্রয়োজন ছিল না, সেখানে তাহার কোন চিহ্নও এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যে সকল জিনিষ মানুষের পক্ষে সব জায়গাতেই থাকা দরকার, তাহা যেখানে মানুষ ছিল সেই খানেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এই সকল জিনিষের গঠন ইত্যাদিতেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একটি সাধারণ উদাহরণ দিলেই এ বিষয় তোমাদের বুঝিতে আর কোন অসুবিধা হইবে না। মানুষের থাকিবার জন্য ঘরের দরকার হইয়াছিল। সেই ঘর মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জিনিষের দ্বারা বিভিন্ন আকারে গঠন করিত। মানুষের বাসগৃহের এই পার্থক্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। খড়ের ঘর, মাটির ঘর, টিনের ঘর, ইট-পাথরের ঘর তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। আর বরফের ঘর না দেখিলেও অনেকে হয়ত উহার কথা শুনিয়াছ। দেশ বিশেষে গৃহনির্ম্মাণের এরূপ পার্থক্য প্রাচীন মানবের সময়েও ছিল। বিভিন্ন স্থানে তাহাদের ব্যবহৃত প্রায় সকল জিনিষেই, কম বেশী এরূপ কোন না কোন পার্থক্য সব সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রীভাবে জীবন যাপন
বসন পরার অন্য কারণ।

শীত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আদি মানবের দেহ রোমাবৃত ছিল। তারপর পশুপক্ষীর চর্ম্ম ও পালক ইত্যাদি দ্বারা তাহারা দেহের আবরণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিল। ফলে দেহে রোমের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া গিয়া এখন যে কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিতেছ। আজ অনাবশ্যক বলিয়া, মানুষের দেহে রোমের আকার খুবই সূক্ষ্ম এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

যদিও দেহরক্ষার জন্য কোন কোন স্থানে গাত্রাবরণ থাকার নিতান্তই প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তবুও শুধু প্রয়োজনের দরুনই যে প্রাচীন মানব বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা মনে হয় না। কেননা গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানে যেখানে শীতের জন্য গায়ের আবরণের কোনই প্রয়োজন নাই, সেখানেও মানুষকে বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা যায়। আর যে স্থানে আমরা শীত-নিবারক গায়ের বিশেষ আবরণ ছাড়া, মানুষের বাঁচিয়া থাকার কল্পনাও করিতে পারি না, সে স্থানেও মানুষকে গায়ের আবরণ ছাড়া বাস করিতে দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার টেরাডেল ফিউগো (Tierradel Fuego) নামক ঠাণ্ডা প্রদেশে এখনও মানুষ উলঙ্গভাবে বিচরণ করিতেছে। ছোটনাগপুরে জুয়াং জাতিরও সেই এক অবস্থা। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন মানবের গাত্রাবরণ ব্যবহারের প্রয়োজন ছাড়া আরও কিছু কারণ ছিল। দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যই সম্ভবতঃ প্রাচীন মানবগণ প্রথমতঃ গায়ের আবরণ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল, পরে অন্য প্রয়োজনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল।

এই আবরণ প্রথমতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীর চর্ম্ম হইতে প্রস্তুত করা হইত। বস্ত্ররূপে গাছের পাতাও যে ব্যবহার করা হইত না তাহা নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণাদিতে গাছের ছাল ও পশুর চর্ম্ম ব্যবহারের

উল্লেখ বহু স্থানে দেখা যায়। বনবাসকালে রাম-লক্ষ্মণের জটাবল্কল ধারণের কথা তোমরা সকলেই জান। এখানে বল্কল অর্থই গাছের ছাল। যোগীরাজ

চর্ম্মের পোষাক পরিহিতা চ্যেলিয়ান নারী পাথরের অস্ত্র দ্বারা চাঁচা ছোলার কাজ করিতেছে

মহাদেবের পরিধানে যে বাঘের ছাল থাকিত, তাহা তোমরা মহাদেবের যে কোন ছবিতেই লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে।

পশুর চর্ম্ম সহজেই পশুদেহ হইতে পৃথক্ করা যায়, তাহা হয়ত তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। গাছের ছাল হইতে কিরূপে যে বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়, তোমরা হয়ত তাহা অনেকেই জান না। উহা প্রস্তুত করাও যে খুব কঠিন ব্যাপার তাহা নহে। গাছের তিন-চারি হাত পর্য্যন্ত লম্বা একটি মোটা কাণ্ড

অথবা ডাল কাটিয়া তাহা হইতে প্রাচীন মানব গায়ের আবরণ প্রস্তুত করিত। কাঠের এই টুক্‌রা হইতে তাহার নলের আকারে বেষ্টিত ছাল পৃথক্ করিয়া জলে পচান হইত। পরে তাহাতে ক্রমাগতঃ আঘাত করিলে যখন উহা বশ কোমল হইত, তখন তাহা গাত্রাবরণরূপে ব্যবহারের বিশেষ কোন অসুবিধা থাকিত না। আলখালার মত উহার উপর দিকে হাতের জন্য দুইটি বড় ছিদ্র করিয়া লওয়া হইত, যাহাতে হাত ঢুকানের পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধা না হয়। গাছের ছালের এই আবরণই ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর হইতেছিল। অবশেষে প্রাচীন মানবের সূতার কাপড়ের দিকেও দৃষ্টি পড়িল। তখন তাহারা সূতার কাপড় প্রস্তুতের দিকে মনোযোগ দিয়াছিল। তাহাতে সূতা পাকান ও কাপড় বুননের উপায় তাহারা ক্রমশঃ উদ্ভাবন করিল। সেই সূতার কাপড় ও তাহার প্রস্তুতপ্রণালী যে এখন কতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা তোমরা সকলেই জান। এইরূপ প্রায় সকল বিষয়েই উন্নততর উপায়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও প্রস্তুতের দিকে প্রাচীন মানবের চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুন্দরের উপাসনায়
ব্যস্ত মানব সর্ব্বদায়,
অতীতের সেই পিপাসার
চিহ্ন আঁকা গুহার গায়।

সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ মানবমনে প্রথম হইতেই স্থান লাভ করিয়াছিল। মানবের নানা বিষয়ে উন্নতির ইহাও যে একটি প্রধান কারণ তাহার কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। প্রাচীন মানবের সেই সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিচয় আমরা তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত অস্ত্র-শস্ত্র, তৈজসপত্র ও তাহাদের বাসস্থান, গুহা প্রভৃতির চিত্রে দেখিতে পাইয়া থাকি।

সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এবং বুদ্ধির প্রবৃত্তি যে শুধু মানুষেরই আছে তাহা নহে, ইতর প্রাণীর ভিতরেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। পশুপক্ষী,

কীট-পতঙ্গের সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ এবং সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা তোমরাও লক্ষ্য করিতে পার। সুন্দর সুন্দর ফুলের দিকে যে প্রজাপতি দলে দলে ধাবিত হয় তাহার প্রধান কারণই ফুলের সৌন্দর্য্য। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে ফুলের মধু এবং গন্ধের আকর্ষণও যে না আছে তাহা নহে। তবে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ অধিকাংশ স্থলেই প্রধান এবং প্রথম। এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। তারপর পশুপক্ষীর দেহে যে নানা রকম বিচিত্র বর্ণের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলেও উহাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানুষ যেমন একটু বড় হইলেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষাতে সজ্জিত থাকিতে ভালবাসে, উহাদের ভিতরেও এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণী অনবরত লেহন করিয়া তাহাদের শরীর পরিষ্কার রাখিতে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। এইরূপ কোন পাখীর দেহই তোমরা অপরিষ্কার দেখিতে পাইবে না। তাহার কারণ উহারা সব সময়ই উহাদের শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করে। আর উদ্ভিদও এ বিষয়ে বাদ পড়ে নাই। ফুল, ফল, লতাপাতা সুন্দর আকার ধারণ করে বলিয়াই ত রাজপ্রাসাদের ভিতরেও ফুলের বাগান দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন প্রাণী হইতেই মানুষের এই সৌন্দর্য্যের পিপাসা কম নহে; বরং সকলের চাইতে বেশী। সেই আদি মানব হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের এই প্রবল সৌন্দর্য্য পিপাসার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা নানা যুগে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। অতীতের মানব, দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ পাথরের টুক্‌রা ছিদ্র করিয়া কবচরূপে ব্যবহার করিত এবং হাড়ের টুক্‌রা, শামুক, প্রাণীর নখ, দাঁত প্রভৃতি তাহারা যে নানারূপে ব্যবহার করিত তাহার চিহ্ন পৃথিবীর স্তরের ভিতরে এখনও বর্ত্তমান আছে। কে জানে যে বর্ত্তমানের অসভ্য জাতির ন্যায়, দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য, তাহারা উল্কি পরিত কি না? দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইতে ক্রমশঃ তাহাদের বাসস্থানের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহারা যে সকল গুহাতে

বাস করিত তাহার ভিতর তাহাদের অঙ্কিত নানারূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে তৎকালীন প্রাণীর ছবিই বেশী। উহাতে মানুষের মনে সেই

প্রাচীন মানবের চিত্রাঙ্কন

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই কলাবিদ্যার প্রতি যে একটা প্রবল আকর্ষণ আছে

তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হাতীর দাঁতের উপর প্রাচীন মানবের অঙ্কিত ছবি এবং হাতীর দাঁতের প্রস্তুত কোন কোন জিনিষ, যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাহাদের এই কলাবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতের নানা স্থানে তাহাদের অঙ্কিত বহু ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেনের উত্তরদিকে গিরিনিস পাহাড়ের আল্টামিরা নামক গুহাতে প্রাচীন মানবের চিত্রিত যে সকল ছবি আছে, তাহাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, উহা অন্ততঃ পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চিত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু এখনও দেখিলে সেদিনের বলিয়া মনে হয়। আর সে ছবিও নিতান্ত সাধারণ ছবি নয়। ছবির প্রত্যেকটি প্রাণী এখনও জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন মানবের এই চিত্রশালা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে উহার চিত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন। গুহার ছাদে, লাল, কাল ও হল্‌দে রংএ এই চিত্রগুলি চিত্রিত। গুহার ভিতরে ঢুকিলেই একটি শূকরের চিত্র সম্মুখে পড়ে। তাহা দেখিলেই মনে হয় যে, শূকরটা যেন মারিবার জন্য তাড়া করিয়া আসিতেছে। বন্য বাইসন, বল্গা হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর নানা অবস্থার বহু চিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত রহিয়াছে, দেখিলেই দক্ষ চিত্রকরের চিত্রিত চিত্র বলিয়া মনে হয়।

সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মানুষ এই গুহা-চিত্রের কোন খবর জানিত না। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সেই দেশের জমিদার তাঁহার মেয়েকে নিয়া প্রাচীন মানবের অস্ত্র-শস্ত্র অনুসন্ধানের জন্য ঐ গুহার কাছে গিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার মেয়ে হঠাৎ "তসর"—অর্থাৎ ষাঁড় বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন হয়ত বা তাঁহার মেয়ে জীবন্ত কোন ষাঁড় দেখিয়াই চীৎকার করিয়াছে। কিন্তু গুহার ছাঁদের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। ছাদের উপর প্রাচীন মানবের চিত্রিত ষাঁড়ের চিত্র দেখিয়াই যে তাঁহার মেয়ে চীৎকার করিয়াছে তাহা বুঝিতে আর তাঁহার বাকী রহিল না। সেই ছবি দেখিয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। সেই হইতে

এই গুহা-চিত্রের কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছে। প্রাচীন মানবের সেই কীর্ত্তি দেখিবার জন্য এখন প্রতি বৎসর বহু লোক সেখানে সমাগত হইয়া থাকেন। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ইউরোপে যাও তবে প্রাচীন মানবের এই চিত্রশালা একবার দেখিয়া আসিও, তাহাতে প্রভূত আনন্দ লাভ করিবে।

প্রাচীন মানবের চিত্র দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা প্রথমতঃ কয়লা দিয়া, ও তারপর নানা রকম রঙের সাহায্যে চিত্র অঙ্কিত করিত।

জলের উপর চলার তরে
মানব করে নৌকা গঠন ;
ইতর প্রাণী বশ করিল
ডাঙ্গায় জিনিষ কর্‌তে বহন।

বাসস্থানের অবস্থান অনুসারে, প্রাচীন মানব যখন জিনিষপত্র জলের উপর দিয়া বহন ও গমনাগমনের জন্য জলযানের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল, তখন জলযান প্রস্তুতের দিকেও তাহাদের মন গেল। তাহা হইতেই প্রয়োজন অনুসারে দেশভেদে নানা রকম জলযানের উৎপত্তি হইয়াছে। জলযানের উৎপত্তির কথা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বড় বড় গাছ জলে ভাসাইয়া তাহার সাহায্যে যে জলে ভাসিয়া থাকা সম্ভবপর, প্রাচীন মানব প্রথমতঃ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তার পরেই কতকগুলি গাছপালা একত্র বাঁধিয়া ভেলা প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ভাবিত হইল। বড় বড় গাছের কাণ্ডের ভিতর গর্ত্ত করিয়া তাহার দ্বারা ডোঙ্গা প্রস্তুত করাতে যে জলের উপর চলাফেরার সুবিধা তাহাও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাতেই ডোঙ্গার সৃষ্টি হইয়াছিল। বৃটনবাসীর পূর্ব্বপুরুষগণ চামের দ্বারা গোলাকার একপ্রকার নৌকা প্রস্তুত করিত। তাহার সাহায্যে তাহারা জলের উপর দিয়া গমনাগমন ও মাছ ধরার কাজ করিতে পারিত। প্রাচীন মানবের ব্যবহৃত পূর্ব্বোক্ত ডোঙ্গার চিহ্ন অনেক যায়গাতেই পাওয়া গিয়াছে। উহার ব্যবহার স্থানে স্থানে এখনও

দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হইতে জলযানের ক্রমোন্নতিতে বর্ত্তমান শতাব্দীতে কত রকম উন্নততর বাষ্পীয় জলযান যে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহাদের সাহায্যে গভীর সমুদ্রের উপর দিয়া চলাফেরা করিতেও মানুষ এখন কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করে না।

গোলাকার চামের নৌকা (Bull boat) বাহনে নিরত প্রাচীন মানব

প্রাচীন মানবের নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য আমাদের মত গৃহপালিত গরু, ঘোড়া, মেষ, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি প্রাণী ছিল না, কিন্তু তাহারা খুব প্রাচীনকাল হইতেই যে কুকুর পুষিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, কুকুরই মানুষের আদি বা প্রথম গৃহপালিত প্রাণী। এখন বন্য কুকুর কিরূপে মানুষের বন্ধুরূপে সর্ব্বপ্রথম তাহাদের সঙ্গ নিয়াছিল তাহা

অবশ্য ভাবিবার বিষয়। পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে নানা মত পোষণ করিয়া থাকেন। কাহারও মত এই যে, শিকারের সময় কুকুর মানুষের যথেষ্ট সাহায্য করে, তা ছাড়া অন্য কাজও করে; সেজন্যই মানুষ প্রধানতঃ কুকুর পুষিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, কুকুর মানুষের গুহাবাসের সময় হইতেই মানুষের আশ্রয়ে আসিয়াছে। সেই অতীত যুগে প্রবল শীতের তাড়নায় মানুষ এবং পশু বিশেষতঃ কুকুরের বন্য পূর্ব্বপুরুষ, পর্ব্বতের গুহার ভিতরে আশ্রয় নিত। সেখানে একত্র বাসের ফলে তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত কুকুর মানুষের বন্ধুরূপেই বর্ত্তমান আছে। শীতের দরুণ গুহামধ্যে আগুন জ্বালাইয়া মানুষ যখন শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিত, কুকুরও সেসময় তাহার কাছে আসিয়া আগুনের উত্তাপ উপভোগ করিত। এরপর শিকার করিবার সময়, কুকুর মানুষের সাহায্যকারী জন্তুরূপে মানুষের সঙ্গে শিকারের পিছন পিছন অনুসরণ করিত।

কুকুরকে শিকার করিবার এই প্রবৃত্তি মানুষের শিক্ষা দিতে হয় নাই। বন্য অবস্থায়ও তাহাদের এই প্রবৃত্তি ছিল। হিংস্র জন্তু বলিয়া সে আপনা হইতেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার শিক্ষা করিত। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য কুকুরকে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক কিছু শিক্ষা দিয়া নানারূপ কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল। এ সকল কথা অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়া থাকে, সুতরাং এই গুহাবাসের সময় হইতেই যে কুকুর মানুষের সঙ্গলাভ কারিয়াছিল তাহাও অভ্রান্তরূপে বলা কঠিন। সৌখীন লোক সখ করিয়া এখনও অনেক বন্য ইতর প্রাণী পুষিয়া থাকেন। সে সকল প্রাণী পোষণে তাঁহাদের সখ ছাড়া আর অন্য কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আপাততঃ মনে হয় না। কালক্রমে সেই বন্য জন্তু গৃহপালিত হইয়া পোষ মানিলে তাহা দ্বারা কেহ কেহ নানা রকম কাজও করাইয়া থাকেন, তাহা তোমরা এখনও দেখিতে পাও। কেহ কেহ ভল্লুক, উল্লুক, বানর প্রভৃতি প্রাণী পুষিয়া ও তাহাদের দ্বারা নানা রকম খেলা দেখাইয়া, টাকা-পয়সা রোজগার

করিতে তোমরা হয়ত সকলেই দেখিয়াছ। বন্য কুকুরের পূর্ব্বপুরুষও যে এইভাবে মানুষের সঙ্গলাভ করে নাই তাহা কে বলিতে পরে? আমাদের গৃহপালিত প্রাণী মাত্রেরই পূর্ব্বপুরুষ এক সময় বন্য ছিল। তাহাদের প্রকৃতি এবং কার্য্য করিবার শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানুষ তাহাদিগের সকলকেই হয়ত এইরূপ নিজেদের সাহায্যকারী প্রাণীরূপে গৃহে স্থান দান করিয়াছিল। তাহারাই কালক্রমে মানুষের গৃহপালিত পশুরূপে পরিণত হইয়াছে। গরু, ঘোড়া, হাতী, মহিষ ও ছাগল প্রভৃতি প্রাণীকে এখনও বন্য অবস্থায় বিচরণ করিতে দেখা যায়। খেদাতে বন্য হাতীর দল আবদ্ধ করিয়া, বহু হাতী এখনও ধরা হইয়া থাকে। কিছুকাল চেষ্টা করিলেই তাহারা বেশ পোষ মানে। তখন মানুষ তাহাদের দ্বারা নানা কাজ করাইয়া থাকে, ইহা ত তোমরা এখনও দেখিতেছ। সুতরাং আমাদের গৃহপালিত প্রাণী যে বন হইতেই এক সময় মানুষের সাহায্যকারী প্রাণীরূপে মানবের সঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছিল তাহা মনে করা খুবই স্বাভাবিক।

এক হইতে বহুর সৃষ্টি,
কারণ বিবর্ত্তন ;
তারই ফলে মানব হ'ল—
বলেন বিচক্ষণ।

জলজ সামান্য একটি জীবন্ত পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার ইতর প্রাণীর উৎপত্তির ভিতর দিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে; একথা শুনিলে নিজেদের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া তোমাদের অনেকেরই মনে হয়ত লজ্জা ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইবে। কিন্তু পণ্ডিতগণ যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, গভীর গবেষণাদ্বারা ইহার সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে একথার ভিতরে যে সত্য

নিহীত আছে, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। তাঁহাদের সে সকল প্রমাণের উল্লেখ এই পুস্তকের স্থানে স্থানে তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই সকল প্রমাণের বিস্তৃত আলোচনা কোন মতেই সম্ভবপর নয়, হয়ত তাহাদের সকল কথা এখন তোমরা সম্যক্ বুঝিতেও পারিবে না। অথচ এই বিবর্ত্তন-বাদের অনুকূলে তাঁহারা এমন কতকগুলি প্রমাণেরও উল্লেখ করেন, যাহার কথা আলোচনা করিলে, তোমাদের বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হওয়ার কোন কারণ নাই। তাঁহাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত সেইরূপ কয়েকটি প্রমাণের কথা এখানে কিঞ্চিৎ বলা হইল। তাহা হইতে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যে সংযোগ কোথায় তাহাও তোমরা বুঝিতে পারিবে।

যে ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে মানব জাতির উৎপত্তির কথা এখানে বলা হইল, তাহা যে শুধু ছোট-বড় বিভিন্ন গাছপালা এবং জীবজন্তুরই উৎপত্তির মূলীভূত কারণ, তাহা নহে। 'অতীতের কথার' প্রথম খণ্ডে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে তোমরা এই ক্রম-বিবর্ত্তনের কার্য্যই দেখিতে পাইয়াছ। নীহারিকা হইতে ক্রমশঃ সৌরজগতের উৎপত্তি এবং তাহাতে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের সমাবেশ, সেই ক্রম-বিবর্ত্তনেরই ফল। সুতরাং এই ক্রম-বিবর্ত্তন চেতন, অচেতন, জড়, সকল রকম পদার্থের সৃষ্টির ভিতরেই কার্য্য করিতেছে।

ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া পৃথিবীর স্তরের ভিতর নানা প্রকার অভিনব প্রাণীর যে চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহা তোমরা 'অতীতের কথা—জীবজন্তু'তে পড়িয়াছ। সে সকল প্রাণীর মধ্যে বহু প্রাণীর বংশধর পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর যাহাদের বংশধর এখনও জীবিত আছে, তুলনা করিলে তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরদিগকেও, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে অসম্ভব রকম পরিবর্ত্তিত দেখা যায়। তারপর এই পরিবর্ত্তন, উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী জগতে, পৃথিবীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছিল, তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায়। ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম স্তরের

দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, প্রাণীর ভিতরে পরিবর্ত্তনের মাত্রা ততই বেশী বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ আধুনিক হাতী ও ঘোড়ার পূর্ব্বপুরুষের কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুগ হইতে যুগান্তরের স্তরের ভিতরে, উহাদের যে দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই একথার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান হইতে অতীতের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই উহাদিগকে বেশী পরিবর্ত্তিত দেখা যায়। তারপর প্রাচীন মানবের সামান্য যে কয়েকটি মাথার খুলি, পৃথিবীর স্তরের ভিতর পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেটি যত বেশী প্রাচীন, ল্যাজহীন বানরের মাথার খুলির সঙ্গে তাহার সাদৃশ্যও তত বেশী। এ সকল প্রমাণ হইতেও ক্রমোন্নতির ধারা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

ছোট-বড় যত রকম প্রাণী আছে, এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত, সকলেরই উৎপত্তি অর্থাৎ আরম্ভ একটি মাত্র কোষ (cell) হইতে। এই কোষের নাম
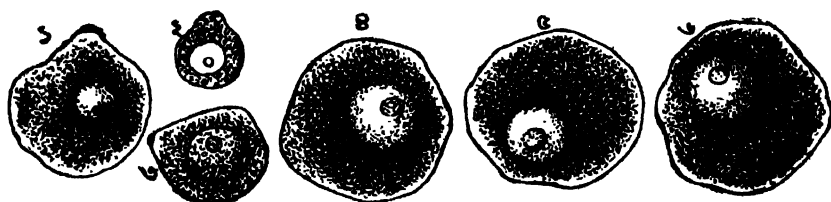
বিভিন্ন প্রাণীর ডিম্বকোষ (egg-cell)

১। স্পঞ্জ, ২। তপস্বী কর্কট, ৩। বিড়াল, ৪। ট্রাউটমাছ (trout), ৫। মোরগ, ৬। মানব

ডিম্বকোষ (egg-cell)। বিশালকায় হাতী, অতি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ, বুদ্ধিমান মানব—সকলেরই জীবনের আরম্ভ একই ভাবে, এই একটিমাত্র ডিম্বকোষ হইতে। এমন কি এই আরম্ভের পর, কম-বেশী কিছুকাল বৃদ্ধি হইলে পরও, কোন কোন স্থলে উহাদের আকার প্রায় একই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। এরপর উহাদের আকারের বিশেষ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, যাহার ফলে নানা শ্রেণীর ও নানা আকারের প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণীর এই

ডিম্বকোষ তোমরা কখনও দেখিবার সুযোগ পাও নাই। তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকে ইহার নামও শুন নাই। তাই বলিয়া উহাকে কখনও তোমরা কাল্পনিক মনে করিও না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের কতকগুলি প্রাণীর ডিম্বকোষের সঙ্গে মানুষের ডিম্বকোষের তুলনামূলক একটি ছবি দেওয়া হইল। নানা রকম প্রাণীর ডিম্বকোষ পরীক্ষা করিয়াই পণ্ডিতগণ এই সত্য নির্দ্ধারণ ।ছেন। ছবিতে লক্ষ্য করিলেই উহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য যে কত বেশী
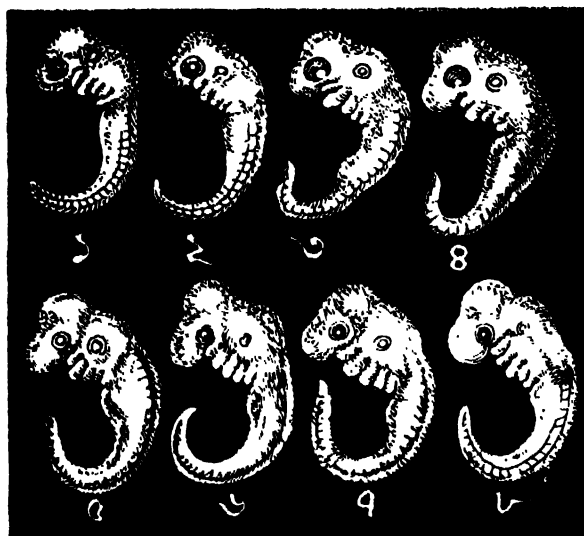
বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ
১। মাছ, ২। সেলামেণ্ডার (salamander), ৩। কচ্ছপ, ৪। মোরগ,
৫। শূকর, ৬। গরু, ৭। খরগোস, ৮। মানব

তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। এক-কৌষিক অর্থাৎ একটিমাত্র কোষবিশিষ্ট এমিবা নামক যে ক্ষুদ্র প্রাণীর কথা সচরাচর তোমরা শুনিয়া থাক, উৎপত্তি-কালীন আকারের হিসাবে, মানুষের সঙ্গে উহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অথচ এই ডিম্বকোষগুলিই যখন শাবক উৎপাদনের অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাহাদের দ্বারাই স্পঞ্জ এবং বিড়ালের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি

বিশিষ্ট প্রাণীর সৃষ্টি হয়। একই রকমের পদার্থ হইতে, এইরূপ বিভিন্ন রকমের প্রাণীর উৎপত্তি, বাস্তবিকই কি একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়?

মানুষের মধ্যে মহাকবি কালিদাস, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, তেজস্বী সার্ আশুতোষ, কিংবা অন্য যে কোন লোকের কথাই বল না কেন, সকলেরই জীবনের আরম্ভ এই একটিমাত্র ডিম্বকোষ হইতে। এই যে ক্ষুদ্র ডিম্বকোষ তাহার না থাকে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, না থাকে কোন সুখ-দুঃখ, না থাকে কোন ভয়-ভাবনা। অথচ এই ডিম্বকোষই, মাতৃগর্ভে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, নয় মাসে একটি সুকুমার শিশুর আকার ধারণ করে। আর এই শিশুরাই, মানব সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া, পূর্ব্বোক্ত মহামানবের ন্যায় যশস্বী মানবরূপে লোক-সমাজে পরিচিত হইয়া থাকে। এখন ভাবিয়া দেখ, এই ডিম্বকোষ হইতে যদি এরূপ মানবের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে, তবে অতীতের সেই আদি পিচ্ছিল জীবন্ত পদার্থের ক্রমোন্নতিতে, মানুষের উৎপত্তি কি নিতান্তই অসম্ভব? পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্য এখনও বহু গবেষণা করিতেছেন। ভবিষ্যতে তোমরাও এবিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা করিবে।

প্রাণীর দেহে অতীতকালের
এমন চিহ্নও আছে,
অদ্ভুত আর অনাবশ্যক
আজ তা মোদের কাছে।

অধিকাংশ প্রাণিদেহের ভিতরে এমন কতকগুলি অবান্তর অঙ্গ থাকে, বর্ত্তমানে তাহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই অঙ্গগুলিকে অঙ্কুরাঙ্গ (rudiments) বলা যাইতে পারে। উহারা হয়ত ইহাদের অতিবৃদ্ধ পিতামহের দেহে বিদ্যমান ছিল এবং তখন তাহাদের একটা প্রয়োজনও ছিল। কোন কোন প্রাণীর ভ্রূণ পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা তাহাতে এইরূপ অনাবশ্যক

কতকগুলি অংশের উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। সময় সময় প্রাণীর দেহে এই সকল অবান্তর অঙ্গের চিহ্ন, শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। তা ছাড়া এমন কতকগুলি অনাবশ্যক অঙ্গের চিহ্ন, ভ্রূণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অচিরেই লোপ পাইয়া যায়, সুতরাং পরে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মাছের ফুল্‌কো তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। মাছের জীবনধারণের পক্ষে উহার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে তাহাও তোমরা জান। অথচ অনাবশ্যক হইলেও, এই ফুল্‌কোর ফাটলের চিহ্ন সরীসৃপ, পাখী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণিদেহে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে ইহাই কি মনে হয় না যে, কোন না কোন সময় এই সকল প্রাণীর জীবন-সংগ্রামের জন্য, এই অঙ্গগুলির অল্প সময়ের জন্য হইলেও, একটা কিছু প্রয়োজন ছিল? একথা যদি সত্য হয়, তবে সেই অতীতে এমন এক সময় গিয়াছে, যখন এই সকল প্রাণীর পূর্ব্বপুরুষই জলের ভিতর মাছের আকারে বাস করিত। তাহাতেই সেই জলচর পূর্ব্বপুরুষের অঙ্গের চিহ্ন, অনাবশ্যক হইলেও, এখনও তাহাদের দেহে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণিদেহে এরূপ অনাবশ্যক অঙ্কুরাঙ্গের (rudiments) আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেহে প্রায় সত্তরটি এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুরাঙ্গের চিহ্ন আছে। ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মতে, ক্রমোন্নতির পথে যে সকল প্রাণিদেহ অতিক্রম করিয়া এই মানবদেহ গঠিত হইয়াছে, উহারা আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদিগেরই দেহের চিহ্ন। সে হিসাবে এই মানবদেহকে পুরাতত্ত্বের একটি যাদুঘর বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এ বিষয়ের আরও দুই-চারিটি সাধারণ উদাহরণের উল্লেখ করিলে বোধ হয়, তোমাদের বুঝিবার পক্ষে আরও সুবিধা হইবে।

মাছ হইতে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্য্যন্ত যত রকম মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে, তাহাদের সকলেরই চক্ষে অর্দ্ধস্বচ্ছ চামের একটি আবরণ থাকে। কাহারও চক্ষে উহা বেশ বড়, আবার কাহারও চক্ষে উহা ছোট, কিন্তু সকলের চক্ষেই উহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের চক্ষেও উহার চিহ্ন আছে, কিন্তু

তাহা খুবই ছোট। চক্ষুর উপরিভাগ মার্জ্জনা করিয়া চক্ষু পরিষ্কার রাখাই উহার প্রয়োজন। তোমরা জলের ভিতর মাছের এবং তোমাদের পরিচিত লক্ষী-পেঁচক নামক পাখীর চক্ষু লক্ষ্য করিয়া দেখিবার যদি সুযোগ পাও, তবে চক্ষু পরিষ্কারের জন্য, এই অর্দ্ধস্বচ্ছ চর্ম্মাবরণের এরূপভাবে ব্যবহার এখনও দেখিতে পাইবে। আমাদের চক্ষে উহা আছে সত্য, কিন্তু এখন আর আমাদের কোন কাজে লাগে না। চক্ষুর অনাবশ্যক অংশরূপেই শুধু তাহা এখনও বর্ত্তমান
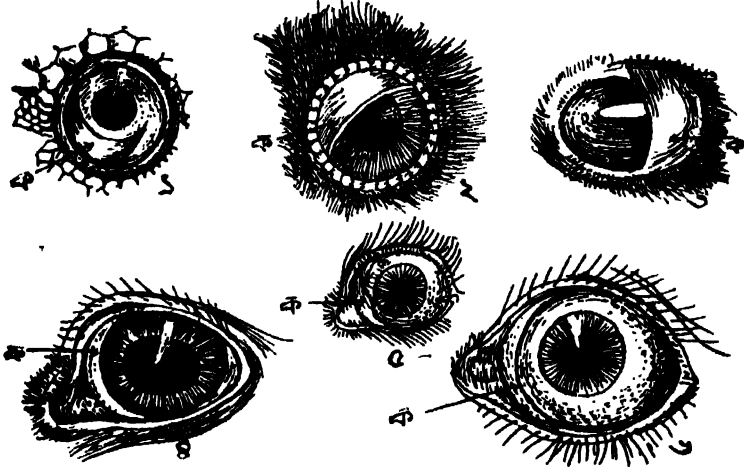
বিভিন্ন প্রাণীর চক্ষে অর্দ্ধস্বচ্ছ চর্ম্মাবরণের চিহ্ন 'ক' চিহ্নিত স্থানে দেখান হইয়াছে

১। কচ্ছপ, ২। পেঁচক, ৩। ঈগল, ৪। ঘোড়া, ৫। ল্যাজহীন বানর, ৬। মানব

আছে। এইরূপ চিহ্নদ্বারা মৎস্য হইতে স্তন্যপায়ী প্রাণী মানুষ পর্য্যন্ত, যত রকম মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই যে একই পূর্ব্বপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন বংশধর, তাহাই অনুমান করা হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর সকলেরই চক্ষে এই অংশ বিদ্যমান থাকার কারণ এ ছাড়া আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এপেনডিসাইটিস (Appendicitis) নামক মানুষের একটি রোগের কথা শুনিয়াছ। মানুষের অন্ত্র মধ্যে এরূপ একটি

ক্ষুদ্র অবান্তর অংশ আছে যাহা কোন কারণে ফুলিয়া গেলে মানুষের ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক এই রোগের উৎপত্তি হয়। কোন কোন উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণীর পক্ষে উহার অবশ্য যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, কিন্তু মানুষের পক্ষে এখন আর তাহার যে কোন প্রয়োজন আছে তাহা মনে হয় না। এই সঙ্গে যে ছবি দেওয়া হইল তাহা হইতে
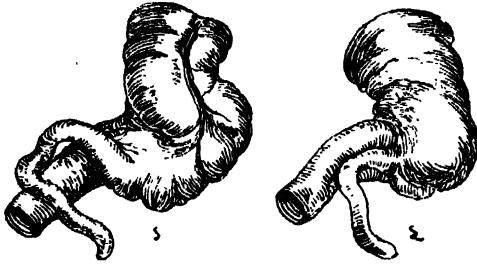
অন্ত্রের অগ্রভাগ (Appendix)
১। ওরাং ২। মানব

উদ্ভিদ্‌ভোজী ওরাঙএর এই অঙ্গ মানবের এই অঙ্গ হইতে যে বেশ বড় তাহা তোমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে। মানুষের উদ্ভিদ্‌ভোজী পূর্ব্বপুরুষের চিহ্নস্বরূপ এই ক্ষুদ্র অঙ্গ, মানবদেহে এখনও বর্ত্তমান থাকার দরুণ কোন সুবিধা না থাকিলেও সময় সময় যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে।

মানুষের ল্যাজ নাই, কতকগুলি বানরও ল্যাজহীন। তা ছাড়া সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীরই ল্যাজ আছে। একথা তোমরা সকলেই জান এবং মানুষের সঙ্গে অন্যান্য ইতর প্রাণীর উহা একটা মস্তবড় পার্থক্য বলিয়া মনে কর। কিন্তু মানব কিংবা ল্যাজহীন বানরের ভ্রূণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাতে উহাদের ল্যাজের চিহ্ন বেশ
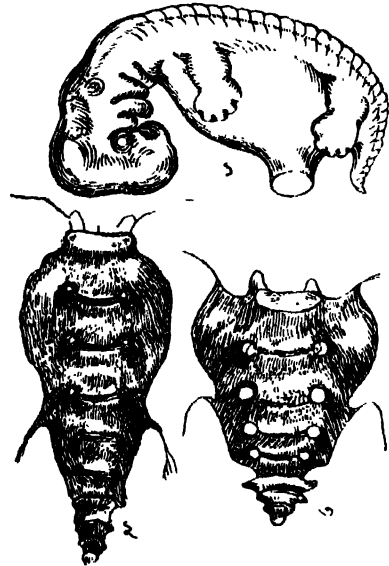
ল্যাজের চিহ্ন
১। মানবের ভ্রূণ ২। গরিলার ল্যাজের কঙ্কাল ৩। মানবের ল্যাজের কঙ্কাল

পরিষ্কার রূপেই বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে। ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজ ছোট হইয়া উহার বাহ্যিক চিহ্ন লোপ হইয়া যায় সত্য, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে কঙ্কাল হইতে সে চিহ্ন এখনও একেবারে লোপ পাইতে পারে নাই। মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ পরীক্ষা করিলেই ল্যাজের ক্ষুদ্র চিহ্ন ধরা পড়ে। গরিলা ও মানবের মেরুদণ্ডের অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ল্যাজের যে চিহ্ন ছবিতে দেখান হইল, তাহা হইতেই তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে। আর প্রাণিদেহের অনাবশ্যক অঙ্গ এরূপভাবে ছোট হইয়া যাওয়ার উদাহরণ তোমরা ত পূর্ব্বেও দেখিয়াছ। সুতরাং মানুষের অনাবশ্যক ল্যাজের এরূপ ক্ষুদ্র আকৃতি হওয়াতে তোমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার আর বিশেষ কোন কারণ নাই।

চতুষ্পদ প্রাণী ল্যাজ এবং কান নাড়াচাড়া করিতে পারে। তাহার কারণ তাহাদের ল্যাজে এবং কানে শুধু এই কাজের সুবিধার জন্যই, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মাংসপেশী আছে। মানুষের কানে এবং ল্যাজের কাছে এই সকল মাংসপেশীর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু এখন আর তাহাদের সে নাড়াচাড়া করিবার শক্তি নাই; অবশ্য তাহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু চেষ্টা করিয়া উহাদের নড়িবার ক্ষমতা এখনও বাড়ান যাইতে পারে। এরূপ ভাবে কোন কোন লোককে কান নাড়িবার ক্ষমতা পুনরায় লাভ করিতেও দেখা গিয়াছে। গরু, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি প্রাণী ল্যাজ ও কান নাড়িয়া পোকা তাড়ায়, সে কাজ এখন আমরা হাতেই করি। এই প্রয়োজন লোপের সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশীগুলির এই শক্তিও লোপ পাইয়াছে। এই সকল কারণ হইতেই মানুষ যে সলাঙ্গুল চতুষ্পদ জন্তুরই বংশধর, ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ তাহার অনুমান করিয়া থাকেন। ভ্রূণের ক্ষুদ্রাবস্থাতে ল্যাজ থাকে, কিন্তু বড় হইলে আর তাহা থাকে না। তাঁহাদের মতে উহার কারণ এই যে, মানবের অতিপ্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ, যাহা হইতে ক্রমশঃ মানবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার আকার তৎকালে নিতান্ত ক্ষুদ্র সলাঙ্গুল চতুষ্পদ অর্থাৎ ইঁদুর অথবা ন্যাংটি ইঁদুরের মত ছিল। সে কারণে মানুষের সলাঙ্গুল ভ্রূণের আকারও নিতান্ত ছোট।

মানুষের পূর্ব্বপুরুষ এক সময় যে বৃক্ষচর বানরের আকারে বর্ত্তমান ছিল, পণ্ডিতগণ সদ্যোজাত মানবশিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়াও তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। জন্মের পূর্ব্বে এবং কিছুকাল পরেও মানবশিশুর পায়ের পাতা ভিতরের দিকে বাঁকান থাকে। পা দ্বারা বানরের মত শাখা ধরিবার ক্ষমতা বৃক্ষবাসকালে, মানবের পূর্ব্বপুরুষের যে ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ। জন্মের অব্যবহিত পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত মানবশিশুর হস্তদ্বারা কোন কিছু ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ উহাকেও মানুষের পূর্ব্বপুরুষের বৃক্ষবাসের প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। এমন কি মানুষ যখন বৃক্ষ হইতে প্রথম জলে পতিত হইয়াছিল, তখন সে স্বভাবগত শিক্ষানুযায়ী গাছের ডালের মত জল ধরিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিল। তাহা হইতেই মানুষের সাঁতার শিক্ষার চেষ্টা সুরু হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।
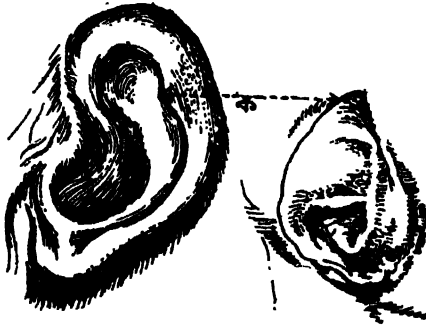
ওরাঙ্ ক্রণের কানের সঙ্গে মানব কানের তুলনা
'ক' চিহ্নিত স্থানে সূচল ডারউইনাংশ
(Darwinian lobe)

মানুষের কানের যে ছবি এখানে দেওয়া হইল তাহার 'ক' চিহ্নিত স্থানে একটি সূচল অংশ দেখিতে পাইবে। উহা জন্মকালে প্রায় সকল শিশুর কানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোকের কানেই উহা সচরাচর স্পষ্ট দেখা যায়। মহামতি ডারউইন সাহেবের নামানুসারে উহাকে ডার্-উইনাংশ (Darwinian lobe) বলা হয়। জন্মের পূর্ব্বে ওরাঙ্ শিশুর কানে এই চিহ্ন বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

বয়স্ক লোমশ মানবের দেহের প্রায় সকল স্থানেই লোমের চিহ্ন দেখা গিয়া থাকে। তাহাদের হাতের লোমের বিন্যাসে, বেশ একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। বাহুর মধ্যগ্রন্থি, কনুইর উপরের ও নীচের অংশে, যে লোম

জন্মে, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা সকলেই কনুইর দিকে হেলানভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। কতিপয় ল্যাজহীন কপি এবং আমেরিকাবাসী বানর ছাড়া, আর কোন প্রাণিদেহে এরূপভাবে রোম উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতেরা মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষের বৃক্ষবাসই, উহারও কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মানুষের সেই পূর্ব্বপুরুষ বৃষ্টির সময় গাছের ডালের উপর মাথায় হাত দিয়া, বৃষ্টির জল নিবারণের চেষ্টা করিত। তখন জলধারা এই রোমের উপর দিয়া বাহিয়া কনুইর অগ্রভাগ হইতে নীচে পড়িয়া যাইত। তাহাতেই হাতের উপর ও নীচের উভয় অংশে উৎপন্ন রোম, কনুইর অগ্রভাগের দিকেই হেলান ভাবে জন্মিত। এখন মানুষ বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিলেও, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বৃক্ষচর অবস্থায় বাহুতে যেরূপ রোমের বিন্যাস ছিল, এখনও তাহা রহিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সময় ওরাঙ্‌কে গাছের উপর এখনও এরূপভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়।

হাতের উপর লোমের বিন্যাস

১। মানব ২। পুং-শিম্পাঞ্জি

পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রাণিদেহের অস্থি-কঙ্কালের সঙ্গে মানুষের অস্থি-কঙ্কালের তুলনা করিয়া মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যে একই পূর্ব্বপুরুষ হইতে ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল প্রমাণের কথাও এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। মানুষ, ঘোড়া, শূকর, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণী সকলেই যে একই পূর্ব্বপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন বংশধর তাহা সহসা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না, কেননা তাহাদের বাহ্যিক আকারের পার্থক্য এত বেশী যে, তাহা সহসা বিশ্বাস হওয়ার মত বিষয় নহে। এই পণ্ডিতদিগের মতে তাহাদের সকলেরই অস্থি-কঙ্কাল এক আদর্শে গঠিত। সময়ে, অবস্থানুযায়ী চলাফেরার পরিবর্ত্তনে, উহাদের দেহের এইরূপ নানারকম পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। তাহাতেই এত সব ভিন্ন ভিন্ন আকারের প্রাণী আমরা দেখিতে পাই। তাহারা সকলেই একই প্রাণীর বংশধর অর্থাৎ এক সময় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ একই প্রাণী ছিল। নানা রকম পশু, বিশেষতঃ ঘোড়ার কঙ্কালের সঙ্গে মানুষের কঙ্কালের তুলনা দ্বারা, পণ্ডিতগণ তাহাদের এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। মানুষ পিছনের পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া চলাফেরা করে, আর ঘোড়া বর্ত্তমানে তাহার চারি পায়ের মধ্যের অঙ্গুলীর মাত্র অগ্রভাগের উপর ভর করিয়া দৌড়াইয়া থাকে। উহাতেই তাহাদের উভয়ের কঙ্কালের গঠন বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; ফলে বাহ্যিক আকারেরও এই ঘোরতর পরিবর্ত্তন। অশ্বদেহের ক্রম-পরিবর্ত্তনের বিষয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে অতীতের কথা—তৃতীয় খণ্ড "জীবজন্তু"তে আলোচনা করা হইয়াছে, বোধ হয় তোমাদের তাহা মনে আছে। মানুষের হাতের এবং পায়ের কঙ্কালের

বিভিন্ন প্রাণীর সম্মুখের অঙ্গের কঙ্কাল

মানুষের হাতের কঙ্কালের অস্থিখণ্ডের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর সম্মুখের অঙ্গের অস্থিখণ্ডের তুলনা, বক্র বিন্দুরেখাদ্বারা দেখান হইয়াছে

১। মানব ২। কুকুর ৩। শূকর ৪। ভেড়া ৫। ঘোড়া

সঙ্গে ঘোড়া ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাণীর পায়ের কঙ্কালের যে তুলনামূলক ছবি দেওয়া হইল, তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলে উহার ভিতরে যে যথেষ্ট সত্য আছে তোমরাও তাহা বুঝিতে পারিবে। পণ্ডিত-দিগের এই মত, আপাততঃ যাহা তোমাদিগের নিকট নিতান্ত অসম্ভব এবং হাস্যাস্পদ বিষয় বলিয়া মনে হয়, তাহাও তোমাদের নিকট সম্ভবপর বলিয়া মনে হইবে। তিমি এবং শীল নামক দুইটি জলচর প্রাণী, যাহাকে অনেকে মাছ বলিয়া ভুল করে, তাহাদের পাখ্‌নার ভিতরকার কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া মানুষের হাত
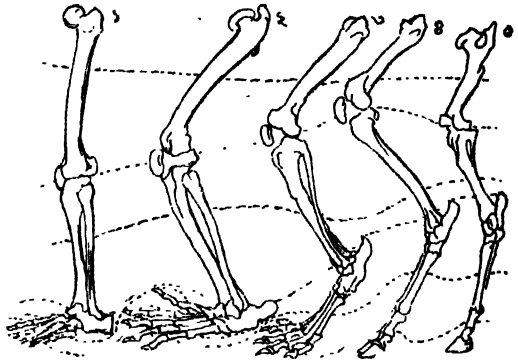
বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের কঙ্কাল

মানুষের পায়ের কঙ্কালের অস্থিখণ্ডের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পিছনের পায়ের অস্থিখণ্ডের তুলনা বক্র বিন্দুরেখাদ্বারা দেখান হইয়াছে।
১। মানব ২। ল্যাজহীন বানর ৩। কুকুর ৪। ভেড়া ৫। ঘোড়া
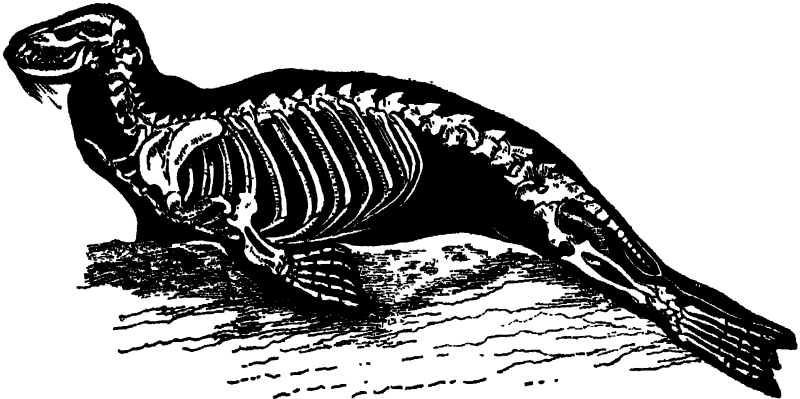
শীলদেহের কঙ্কাল

পায়ের সঙ্গে যে উহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে তাহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন

অতীতের কথা

শিলীভূত প্রাগৈতিহাসিক মানব-দেহের যাহা কিছু পৃথিবীর স্তরের ভিতর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয় যে, কিরূপভাবে মানব-দেহ গঠিত হইলে তাহার জীবন-সংগ্রামের সুবিধা হয়, সেজন্য প্রকৃতিদেবী যেন নানাভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন। বর্ত্তমানের হাতী-ঘোড়ার দেহগঠনে প্রকৃতির এই খেয়ালের পরিচয় তোমরা ইতিপূর্ব্বেই "অতীতের কথা, জীবজন্তুতে" পাইয়াছ। কত যুগ যুগান্তরের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যে তাহারা বর্ত্তমান আকার লাভ করিয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। মানুষের বেলাও তাহার কোন ব্যত্যয় হয় নাই।

নিতান্ত নিম্ন স্তরের বন্য অসভ্য মানব এবং উচ্চ স্তরের ইতর প্রাণী যদি এখনও পরস্পর তুলনা করিয়া দেখ, তবে তাহাদের উভয়ের আচার-ব্যবহার ও চালচলনের ভিতর পার্থক্য খুব কমই দেখিতে পাইবে। ল্যাজহীন বানর এবং নিম্ন স্তরের এই সকল মানবের বহু খবর এখনও আমাদের অজ্ঞাত। উহাদের সকল কথা জানিতে পারিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের কারণ থাকিবে না। অনুসন্ধান দ্বারা তোমরা এ সকল বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া দেখিও, তাহা হইলে ইহাতে যে কি অপরিসীম আনন্দ নিজেরাই তাহা বুঝিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে।